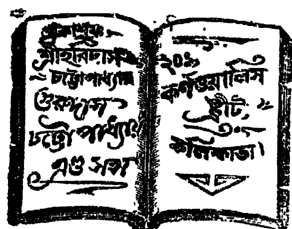
আট-আনা-সংস্করণ-গ্রন্থমালার চতুঃসপ্ততিতম গ্রন্থ

বাজীকর

শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থী

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স,
২০৩৷১৷১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

চৈত্র—১৩২৮



প্রিণ্টার—শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী
কালিকা প্রেস,
২১, নন্দকুমার চৌধুরীর ২য় লেন, কলিকাতা

বাজীকর

আমি ফিরছিলুম কুতুব-মিনার দেখে। বাংলার মোলায়েম জমির-উপর-চ'রে-বেড়ান এই ললিতলবঙ্গ দেহযষ্টি, দিল্লীর ফরমায়েশী একার তালকানা ঝাঁকুনি খেতে-খেতে যখন প্রায় বেঁকে এসেছে, এমন সময় নেমে পড়লুম।

একাওয়ালা আমায় নামিয়ে দিয়ে গেল পুরোন দিল্লীর ভগ্নস্তূপের মধ্যিখানে। চতুর্দ্দিকে বড়-বড় প্রাসাদ, কবর, দুর্গ—কোনটা হাত-পা-ভাঙ্গা, বিকট রাক্ষসের মত দাঁত-খিঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, কোনটা বা একেবারে ভূমিসাৎ হয়ে শুধু কতকগুলো ইট আর পাথরের রাশি হয়ে পড়ে রয়েছে। এরি মাঝে-মাঝে এক-একটা চক্‌চকে পাথরের কবর অরক্ষিত জঙ্গলময় বাগানের মধ্যে বসোরার গোলাপের মত ফুটে রয়েছে। সৃষ্টি আর প্রলয়ের এমন কোলাকুলি এর আগে আর চোখে পড়েনি। যতদূর চোখ যায়—দেখতে পেলুম, সৃষ্টি আর সংহারের সীমা-রেখা গিয়ে মিশেছে, নতুন দিল্লীর টক্‌টকে লাল পাথরের কেল্লার পায়ের কাছে,—ঠিক যেন আহত বীর জেতার পায়ের উপর মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে রয়েছে। সমস্ত দিন রোদে পুড়ে পাথরগুলো থেকে একটা গরম ঝাঁঝ বেরুচ্ছিল; সেগুলোর উপর দিয়ে চলতে-চলতে আমার মনে হচ্ছিল,

আহতের তপ্ত শোণিতের উত্তাপে বুঝি পায়ের তলাটা একেবারে ঝল্‌সে গেল।

সেই জনশূন্য নির্জ্জন শ্মশানে তার সঙ্গে আমার দেখা—

তখনো সন্ধ্যে হতে অনেক দেরী। সমস্ত দিন ঘুরে-ঘুরে দেহটা বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল; তাই বিশ্রামের জন্য একটা চাতাল-দেওয়া কবরের উপর শুয়ে পড়েছিলুম। জায়গাটা বেশ ঠাণ্ডা বোধ হচ্ছিল। মনে হল, একটু গড়িয়ে নিয়ে, অন্ধকার হবার আগেই উঠে পড়া যাবে। একটু ক্ষণ শুয়ে থাকার পরই আমি যেন কার গলার আওয়াজ পেলুম। মনে হল, অনেক দূরে কে যেন গান গাইছে। গানের আওয়াজটাই ভেসে-ভেসে আমার কাণে আস্‌ছিল; কোন্ ভাষা, কি সুর—তা' সেখান থেকে একেবারেই বোঝা যাচ্ছিল না। কৌতূহল হল, কে গায়! সেই নির্জ্জন প্রান্তরে বুঝি বা একজন সঙ্গী পাওয়া গেল মনে করে, উঠে পড়লুম। আওয়াজ শুনে-শুনে সেই দিকে অগ্রসর হতে লাগলুম। কিছুক্ষণ ঠোক্কর খেতে খেতে অগ্রসর হবার পর তার সঙ্গে দেখা হল। সে গাইছিল—

"মনুয়া দিন তেরে কেইসে গুজারা—
আবু রাতি কারি ঘন—"

লোকটার চেহারা রুক্ষ, মাথার চুল কতকগুলো পেকে গিয়েছে, বাকিগুলো না পেকেই সাদা হয়ে রয়েছে,—বোধ হয় ধূলোতে। গোঁফ একেবারে নেই বল্লেই হয়। চোয়ালের কাছে চাড়ি করে দাড়ি—মাঝখানে একটু ফাঁক আছে। আবার

ঠোঁটের নীচে কয়েকগাছা দাড়ি। অত্যন্ত রোগা। কাপড়-চোপড়ের অবস্থাও দেহের মতন। তার চেহারাটা তার চারপাশের ইট-পাটকেলগুলোর সঙ্গে এমন ভাবে মিল খেয়ে গেছে যে, প্রথম দৃষ্টিতেই মনে হয় যে, তাদেরি একজন বুঝি অতীত ইতিহাসের সাক্ষ্য দেবার জন্য এখনও এই জায়গাটাতে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বয়সটা তার ঠিক অনুমান করতে পারলুম না,—পঁয়ত্রিশও হতে পারে, আর তিপ্পান্ন বললেও অসম্ভব বলে মনে হবে না। আপনার মনে গান ধরেছে—"মনুয়া দিন তেরে কেইসে গুজারা—"

সেইখানে বসে-বসে তার সঙ্গে আস্তে-আস্তে আমার পরিচয় হয়েছিল: সে অনেক দিনের কথা। তার পর আমি অনেক-বার দিল্লীতে গিয়েছি,—অনেকবার সেই জনমানবহীন ধ্বংস-স্তূপের মধ্যে তার সন্ধানে ঘুরে বেড়িয়েছি; কিন্তু তার সঙ্গে আমার আর দেখা হয় নি। সেইখানে বসে বসে সে তার জীবনের কাহিনী আমায় শুনিয়েছিল। তারই যতটা আমার মনে আছে, এখানে বলছি—

"দিল্লীর কাছে বুঁদলসর নামে এক গ্রাম আছে—সেই গ্রামে আমার বাড়ী। আমার বাড়ী মানে, সেইখানে আমি জন্মেছিলুম। এর বেশী সে জায়গা আমার কাছে আর কিছু দাবী করতে পারে না।

বাড়ীর কথা আমার বড় বেশী মনে নেই। স্বপ্নের মত মনে পড়ে, আমার একটি ছোট ভাই ছিল। আমার খেলার সঙ্গীদের

কারো নাম বড় একটা মনে নেই—শুধু একজন ছাড়া। সে একটী ছোট্ট মেয়ে,—তার নাম ছিল রত্না। সুন্দর ফুট্‌ফুটে মেয়েটি আমার বড় অনুগত ছিল। আমার কেন জানি না, আর সকলের চেয়ে তার সঙ্গেই বেশী বনিবনাও হত ; তাকে আমি বড় ভালবাসতুম।

শৈশবেই মা মারা গিয়াছিলেন। শুনেছিলুম, আমার ছোট ভাই হবার মাসখানেক পরেই তিনি মারা যান। মাকে জান্‌বার অবসর আমার কখনো হয় নি। আমাদের বিমাতা ছিলেন। তিনি আমার উপর কেমন ব্যবহার করতেন, মনে নেই ; আর সে সময় বিমাতার ব্যবহার বুঝতে পারবার মতন বয়স হয়নি। তবে একদিন বুঝতে পেরেছিলুম, বিমাতা কেন, অতি-বড় শত্রুও সে রকম ব্যবহার করতে পারে না। সে কথাটা শেষে বলছি।

তখন আমার ছয় কি সাত বছর মাত্র বয়স, এমন সময় আমাদের গাঁয়ে এক বাজীকর এসে উপস্থিত হল। তার হাতে একটা ডুগডুগি ; সঙ্গে এক রামছাগল—তার পিঠে একটা পুঁটলীর মত কি চাপানো ; বগলে একটা ছেঁড়া নেকড়ার পুঁটলী —এই তার সম্বল। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে সে তার বিদ্যের জোরে গ্রামের মধ্যে বেশ প্রতিপত্তি জমিয়ে নিলে। পায়ের নীচে লোহার গুলি রেখে, সেটাকে নাক দিয়ে বার করা—হাতের ভিতর টাকা রেখে দিয়ে, বনমানুষের হাড় ঠেকিয়ে, সেটাকে উড়িয়ে দেওয়া,—আমের আঁটি পুঁতে তখনি-তখনি গাছ বের করা,—এই রকম সব অদ্ভুত ব্যাপার দেখে, গ্রামের লোকেরা তাকে বাহবা ত দিলেই, সঙ্গে-সঙ্গে পয়সাও দিতে লাগল।

আমরা—ছোট ছোট ছেলেমেয়েরাও দল বেঁধে মাঠের ধারে তার বাজী দেখতে যেতুম। সে রোজই বিকেলবেলায় ডুগডুগি বাজিয়ে, লোক জমিয়ে এই সব বাজী দেখাত, আর পয়সা উপায় করত।

একদিন দুপুরবেলা কি যেন একটা কাজে আমি রাস্তায় বেরিয়েছিলুম। সে সময় গরমের চোটে লোকে ঘরে বসেই অতিষ্ঠ হ'য়ে উঠে। বাইরে ঝম্‌ঝম্‌ রোদ—মনে হচ্ছিল, যেন আগুনের বৃষ্টি হচ্ছে। সে সময় যে কি কর্‌তে রাস্তায় বেরিয়ে-ছিলুম, তা ঠিক মনে নেই, বোধ হয় রত্নাদের বাড়ীতে যাচ্ছিলুম। যেতে-যেতে দেখলুম, সেই বাজীকর একটা গাছের নীচে বসে রুটি খাচ্ছে, আর তারই একটু দূরে ছাগলটা বসে-বসে ঝিমুচ্ছে। তাকে দেখতে পেয়ে আমি বল্লুম—"সেখজি সেলাম!"

লোকটা খেতে-খেতে মুখ তুলে আমায় বল্লে—"এই,—এত রোদে রাস্তায় বেরিয়েছিস্‌ কেন? তোর কি বাপ-মা নেই না কি?

আমার কি খেয়াল হল—আমি সে কথার কোন উত্তর না দিয়ে, তাকে বল্লুম—"আমায় তোমার বিদ্যে শেখাবে সেখজি?"

সে বল্লে—"আচ্ছা শেখাব; দাঁড়া, আমার খাওয়াটা শেষ হয়ে যাক্‌।"

পাছে তার ছোঁয়া লাগে, এই ভয়ে আমি একটু দূরে বসে তার খাওয়া দেখ্‌তে লাগলুম। খেতে খেতে সে এক-একবার

আমার দিকে মুখ তুলে তাকাতে লাগল, আর যেন বিড়-বিড় করে কি বকতে লাগল।

খাওয়া শেষ হয়ে গেলে, সে আমাকে আমার বাড়ীর কথা জিজ্ঞাসা করলে,—আমার বাড়ীতে কে-কে আছে, বাপ মারে কি না ইত্যাদি সব প্রশ্ন। আমার সঙ্গে কথা বলতে-বলতে তার চোখ দুটো থেকে-থেকে জ্বলে উঠতে লাগল। মানুষের সে রকম চোখ একমাত্র তার ছাড়া আর আমি দেখি নি। ক্ষুধাতুর জানোয়ারের সামনে খাবার পড়লে তার চোক যেমন হয়, এও ঠিক সেই রকমের। তার চোখে সেই রকম চাহনি দেখে, আমার শিশু-হৃদয় ভয়ে আঁতকে উঠল। আমি ভয় পেয়েছি বুঝতে পেরে, সে আমার হাত দুটো ধরে বল্লে—"ভয় কি! কিছু ভয় নেই। আজ সন্ধ্যে বেলা কোন রকমে আমার কাছে আসিস্, আমি সব শিখিয়ে দেব। দেখিস্, সঙ্গে আর কাউকে আনিস্‌নি, তা'হলে কিছু শেখা হবে না।"

ভয়-মেশানো একটা আনন্দে সে দিন সমস্ত ক্ষণটা আমার কোথা দিয়ে কেটে গেল। সঙ্গীদের সঙ্গে ভাল করে খেলায় যোগ দিতে পারলুম না। কথাটা আর কাউকে বলি নি ; কারণ, সে বলতে বারণ করে দিয়েছিল। কিন্তু রত্নাকে না বলে থাকতে পারলুম না। আমার কথা শুনে সে বল্লে, "তবে আমিও যাব।" আমি তাকে বুঝিয়ে বল্লুম, "অন্য লোক গেলে সে শেখাবে না বলেছে। ভয় কি,—আগে আমি শিখে আসি, তার পর তোমায় শিখিয়ে দেব।" সন্ধ্যা হবার একটু পরেই সকলের অজ্ঞাতসারে

আমি বেরিয়ে পড়লুম। আমার জন্য সেই গাছতলায় সে অপেক্ষা করছিল। আমি কাছে যেতেই, সে আমার হাত ধরে বল্লে—"এখানে না—চল, একটু দূরে যাই। কেউ দেখ্‌তে পেলে হবে না।" এই বলে সে আমাকে টেনে নিয়ে চলতে লাগল।

সেই জমাট অন্ধকারের ভিতর দিয়ে—কখনো রাস্তা, কখনো মাঠ—কিছুক্ষণ দৌড়ে, কিছুক্ষণ হেঁটে,—আমরা যে কতদূর চলে গেলাম, তার ঠিকানা নেই। হাত-পা সব অবশ হয়ে আসছিল ঘুমে চোখ ঢুলে আসতে লাগল। কোথায় যাচ্ছি,—কেন সে আমায় এতদূরে টেনে নিয়ে যাচ্ছে—এ সব কথা তাকে জিজ্ঞাসা করবার আগেই, আমি এক জায়গায় ঘুমিয়ে পড়লুম!

ঘুম যখন ভেঙ্গে গেল, তখন দেখি, সকাল হয়ে গিয়েছে। জেগে দেখি, যে জায়গাটাতে শুয়ে পড়েছিলুম—সেখানে নেই,—একটা রেল ষ্টেশনের বেঞ্চির উপর আমি শুয়ে আছি। ঘুম ভাঙ্গতেই বাড়ীর কথা মনে হল,—আমি ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলুম। আমার কান্না দেখে চুপি চুপি সে আমায় বল্লে,—"কাঁদিস নে; তা'হলে কোতোয়ালে ধরে নিয়ে যাবে।" কোতোয়ালের নাম শুনেই ভয়ে আমার কান্না থেমে গেল। সে আমার হাতে কিছু খাবার দিয়ে বল্লে—"এই নে, খা। খবরদার আর কাঁদিস না।"

একটু পরে একখানা ট্রেনে করে সে আমায় এই সহরে নিয়ে এল। সহর থেকে মাঝে-মাঝে গাঁয়ে গিয়ে সে তামাসা দেখাত আর আমায় নিয়ে যেত। কিন্তু সহরে থাকতে সে আমায় বাড়ী

থেকে বেরোতে দিত না। লোকে জানত, আমি তার ছেলে,—ছেলে বলেই সে সকলের কাছে আমার পরিচয় দিত। অন্য সময় সে আমায় খুবই আদর-যত্ন করত বটে; কিন্তু বাড়ী যাবার জন্য কাঁদলে, সে ভীষণ মূর্ত্তি ধরত। শেষে আমি মুখে কোন কথা জিজ্ঞাসা করতুম না বটে; কিন্তু যখনই একমনে বাড়ীর কথা ভাবতুম,—কি করে যে সে বুঝতে পারত, তা বলতে পারি না। আমার মুখে মনের কথাগুলো ফুটে উঠত, না, আমার মনের কথাগুলো তার কাণে গিয়েবাজতে থাকত—ঠিক বুঝতে পারতুম না। কতদিন স্বপ্নে তার সেই সময়কার ভীষণ মূর্ত্তি দেখে, ভয়ে ঘুম থেকে উঠে পড়েছি, তার ঠিকানা নেই।

ক্রমে এমন হয়ে গেল—আস্তে আস্তে বাড়ীর কথা দেশের সেই উন্মুক্ত মাঠ, শৈশব-সহচরী রত্না এদের স্মৃতি আমার মন থেকে মুছে যেতে লাগল। তার সঙ্গে ঘুরে বেড়াই—মাঠে, ঘাটে, পথে-পথে, এক সহর ছেড়ে অন্য সহরে। কোন দিন ভাল খাওয়া জোটে; কোন দিন আধ-পেটা, কোন দিন অনাহার—এমনি করেই আমার দিন কাটছিল। প্রায় বছর ছয়েক এমনি করে কাটবার পর, একদিন আমরা আলিগড় সহরে, রাস্তার এক জায়গায় লোক জমা করে বাজী দেখাচ্ছি, এমন সময় ভিড়ের ভিতর থেকে একজন লোক ঠেলে বেরিয়ে এসে, আমার পালককে জিজ্ঞাসা করলে—"এ ছেলেটী কার?" লোকটার প্রশ্ন শুনেই মোবারকের (তার নাম মোবারক) হাত থেকে লোহার গুলি, হাড়—মাটিতে ঠস্‌ঠস্‌

করে পড়ে গেল। আগন্তুক চেঁচিয়ে বলতে লাগল, "এই বদমাইস আমাদের গ্রাম থেকে ছেলেটাকে আজ কয়েক বছর হল চুরি করে নিয়ে এসেছে। এ হিন্দুর ছেলে—একে মোসলমানের রুটি খাইয়েছে—" আর বলতে হল না,—এই অবধি শুনেই ভিড় ভেঙ্গে যত লোক তার উপর গিয়ে পড়্ল। কিল, চড়, লাথি মেরে তাকে সবাই মিলে প্রায় আধ-মরা করে ফেল্লে। তাকে মারার পর সকলে আমাকে প্রশ্ন করতে লাগল। সে সময় একটা করুণ মিনতিভরা দৃষ্টিতে সে আমার দিকে তাকিয়েছিল, তা আজও আমার স্পষ্ট মনে পড়ে। পৃথিবীতে সে-ই আমার একমাত্র বন্ধু ছিল। বাবু সাহেব, আজও তার কথা মনে হলে, আমি চোখের জল রাখতে পারি না।"

এই বলে, সে একবার তার জলভরা, চক্‌চকে চোখ-দুটো হাত দিয়ে মুছে নিলে।

"আগন্তুক আমাদের গাঁয়ের লোক, দু-একদিন বাদে সে দেশে যাবে। সকলে মিলে ঠিক করে দিলে, সে আমাকে ও মোবারককে আমাদের গাঁয়ে ধরে নিয়ে যাবে। সেখানে পঞ্চায়েতের বিচারে তার যা সাজা হয় হবে,—কিন্তু এখানে তাকে ছাড়া হবে না। কয়েকদিন পরে ট্রেনে চড়ে আমরা দেশে ফিরলুম। আমার জন্মভূমি,—যেখানকার মাটির উপর প্রথম আমি দু'পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে শিখি,—পৃথিবীতে এসেই যেখানকার বাতাস নিশ্বাস নিয়ে আমি ধন্য হয়েছিলুম,

—সেখানকার ধূলো-বালি—সে যে আমার সোণা;—অনেক দিন পরে আবার সেখানে পা দিতেই, আমার সর্ব্বাঙ্গে একটা পুলক খেলে গেল,—চোখ দুটো জলে ভরে উঠল। একেবারে ভুলে-যাওয়া সেই রাস্তা, গাছ, জোয়ারের ক্ষেতগুলো বাতাসে দুলে উঠে এই অভাগাকে অভিনন্দন করতে লাগল।

সন্ধ্যেবেলা মাঠের মধ্যে আমাদের গাঁয়ের পঞ্চায়েত বসল। গ্রামশুদ্ধ লোক—ছেলে বুড়ো সকলেই আমাকে দেখতে এসেছে। আমার চারপাশে দাঁড়িয়ে, হাঁ করে, তারা আমায় দেখতে লাগল। কিন্তু কেউ আমার কাছে আসছিল না,—যেন আমি কি একটা অদ্ভুত জীবে পরিণত হয়েছি। আমার খেলার সঙ্গীরাও কেউ-কেউ আমায় দেখতে এল। দেখলুম, রত্নাও তাদের একপাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে। দেখলুম, তার চোখ দুটো জলে ভরে উঠেছে। তার মুখ দেখে মনে হচ্ছিল, সে যেন আমায় কিছু বলতে চায়,—কিন্তু সাহস করে বলতে পাচ্ছে না। তার সঙ্গে কথা বলবার জন্য, বন্ধুদের সঙ্গে আবার সেইরকম করে খেলে বেড়াবার জন্য আমার প্রাণটা ব্যাকুল হয়ে উঠতে লাগল।

পঞ্চায়েত আরম্ভ হল। এক একজন উঠে তার বক্তব্য বলতে লাগল। কেউ বল্লে, মোসলমানের রুটি খেয়েছে—ওকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। কেউ বল্লে, বদমাইসকে ধরে কোতোয়ালীতে নিয়ে যাও। কেউ বল্লে, ওকে ধরে কয়েক ঘা দিয়ে টাকাকড়ি যা আছে সব কেড়ে নিয়ে ছেড়ে দাও।

একজন দয়ালু বৃদ্ধ উঠে বল্লে, ছেলে ফিরিয়ে পাওয়া গেছে, আবার কি! ওকে ছেড়ে দাও। এই রকম প্রায় জন দশ-বারো লোকের মন্তব্যের পর আমার বাবা উঠে দাঁড়ালেন। চারিদিকে একবার চেয়ে নিয়ে, গলাটা একটু সাফ করে' তিনি কি বল্লেন;—কি যে বল্লেন, তা শুধু আমি নয়, সেখানে কেউ শুনতে পেলে না। সকলে বলতে লাগল, "কিছু শুনতে পাচ্চি না, একটু জোরে।" একটু ক্ষণ বাদে এই কথাগুলো আমার কাণে এসে পৌঁছল—"আমি অনেকদিন হল, এই মোসলমানকে আমার ছেলে দান করেছি; ছেলের উপর আমার কোন দাবী-দাওয়া নেই।" বাবার কথা শুনে, সেই জনসঙ্ঘ কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য একেবারে স্থির, নিস্তব্ধ হয়ে গেল। তার পর একটা অস্ফুট আওয়াজ ভিড়টার একদিক থেকে আরম্ভ করে, ক্রমে সমস্ত জায়গাটাতে ছড়িয়ে পড়ল। আমার মনে হল, কে যেন আমার পা দুটো ধরে খানিকক্ষণ জোরে ঘুরপাক দিয়ে, ছুঁড়ে ফেলে দিল।

পঞ্চায়েত ভেঙ্গে গেলে যে যার বাড়ী ফিরে গেল। গ্রামের ধারের মাঠের উপর বাজীকর একটা ছোট তাঁবু ফেলেছিল। আমার হাত ধরে, সে সেখানে নিয়ে এসে, আমাকে তার বুকের মধ্যে চেপে ধরে বল্লে,—"বেটা, দুঃখ করিস্‌নি। ও তোর বাপ নয়,—বাপ হলে এমন কথা বল্‌তে পারত না।"

সে দিন কি পৃথিবীর যত অন্ধকার নিজেদের বাসা ছেড়ে আকাশে বেড়াতে বেরিয়েছিল? আমি তাঁবুর বাইরে একটা

জায়গায় বসে ছিলুম। সংসারের উপর একটা ভীষণ আক্রোশ আমার বুকের ভিতর ফুলে-ফুলে গর্জ্জে উঠছিল। ভাবছিলুম, আমার কি কেউ নেই? আমি কি কারো নই? প্রাণের ভিতরকার সেই ভীষণ অন্তর্দ্দাহে আমি এক একবার নিষ্ফল আক্রোশে হাত-পা ছুঁড়তে লাগলুম। উপরকার চাঁদটা অন্ধকার চাপা পড়ে, দম আট্‌কে মরবার উপক্রম হয়ে, মধ্যে-মধ্যে হাত-পা ছুঁড়ে বেরিয়ে পড়বার চেষ্টা করছিল। একবার আলো, একবার অন্ধকার—দেখে দেখে আমার মনে হচ্ছিল, সমস্ত পৃথিবীটাই বুঝি আমার সঙ্গে পরিহাস করতে আরম্ভ করেছে। মাটির দিকে মুখ করে আমি চোখ বুঁজিয়ে ফেললুম। কতক্ষণ এ রকম ভাবে বসেছিলুম, বলতে পারি না। সেই রকম অবস্থায় আমার প্রাণের মধ্যে সাড়া পেলুম,—কে যেন আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। চোখ চেয়ে দেখি, সত্যই কে যেন আমার সামনে দাঁড়িয়ে ;—সেই ভীষণ অন্ধকারের ভিতরেও সে মুখ চিন্‌তে আমার দেরী হল না। দেখলুম সে কাঁদছে—সচল মুক্তোর মত বড়-বড় অশ্রুবিন্দু তার গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে।

সংসার তার বন্ধন থেকে আমায় মুক্তি দিয়াছিল,—সে মুক্তি ত আমি চাই নি। রত্নাকে দেখে আমার মনে হল, আবার বুঝি সংসার তার একজন অনুচরকে আমার সঙ্গে ঠাট্টা করবার জন্য পাঠিয়ে দিয়েছে। বেরাল যেমন মুমূর্ষু ইঁদুরটাকে এক-একবার ছেড়ে দিয়ে দূরে বসে মজা দেখে,—আমার মনে হল, সংসার বুঝি আমার সঙ্গে সেই রকম মজা আরম্ভ করেছে।

আমার বিপদ যে একমাত্র সেই অনুভব করে' আমায় সান্ত্বনা দিতে এসেছে, তা তখন আমার মনে হয় নি,—বুঝি সে কথা মনে হবার মত অবস্থা আমার তখন ছিল না। আমি তার হাতটা ধরে চীৎকার করে বল্লুম—"সয়তানি! কি করতে এসেছিস্? আমায় ভোলাতে? বল কে তোকে এখানে পাঠিয়ে দিয়েছে?"

কাঁদতে-কাঁদতে আমার নাম ধরে সে বল্লে, "মনুয়া—" রাগে, দুঃখে আমার ইচ্ছা কচ্ছিল, তাকে ধরে তখুনি আছ্‌ড়ে মেরে ফেলি। কিন্তু তা পারলুম না। তার কান্না দেখে আমার ও কান্না আসতে লাগল। নিজেকে একটু সামলে নিয়ে তাকে বললুম, "রত্না, গ্রামশুদ্ধ লোকের মধ্যে তুমিই একমাত্র আমার দুঃখে সহানুভূতি জানিয়েছ। কাল সকালেই আমরা এখান থেকে চলে যাব,—জানি না, আর আমাদের কখনো দেখা হবে কি না—" বলতে-বলতে আমার গলাটা কে যেন চেপে ধরলে, আর আওয়াজ বেরুল না। অনেক কথা আমার তাকে বলবার ছিল, কিন্তু কিছু বলা হোল না। রত্না বল্লে, "তোমার বিমাতার মন্ত্রণায় তোমার বাবা এই রকম করেছে; নইলে—" আমি পাগলের মত চীৎকার করে উঠলুম, "নইলে—নইলে, কি হ'ত রত্না"—আমার চীৎকার শুনে সে থেমে গেল—আর কোন কথা তার মুখ দিয়ে ফুটল না। অনেকক্ষণ আমরা সেই ভাবে দাঁড়িয়ে রইলুম। তার পর আস্তে-আস্তে সে ফিরে গেল। সেই আলো-আঁধারে-মেশা রাত্রির অন্ধকার

ঠেলে, আমার সজল চোখের দৃষ্টি যতদূর যায়, তাকে দেখতে লাগলুম, দেখলুম। রাত্রির সেই ক্ষুধিত অন্ধকার আমার প্রাণের আলোকে নিমিষের মধ্যে গ্রাস করে ফেল্লে।

রত্না চলে যাবার পর আমার প্রথম কথা মনে পড়ল, আমার বিমাতার ব্যবহার। মনে হল, হায়, আমার নিজের মা যদি থাকত! নিজের মাকে মনে করবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করতে লাগলুম ; কিন্তু সে মুখ আমার মনে পড়ল না! প্রাণ খুলে একবার মা বলে চীৎকার করে উঠলুম। আমার সেই চীৎকারে উপরকার অন্ধকার কেটে গিয়ে, চাঁদের আলোতে পৃথিবীটা ভেসে উঠল। দূরের গাছগুলাও যেন সহস্র কণ্ঠে মা বলে' সাড়া দিয়ে উঠল। আমি আর সহ্য করতে পারলুম না, সেইখানে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে গেলুন। যখন জ্ঞান হল, দেখলুম মোবারকের কোলে আমি শুয়ে রয়েছি।

পরদিন সেখান থেকে ডেরাডাণ্ডা তুলে আমরা বেরিয়ে পড়লুম। তারই সঙ্গে বেড়াই ; সে যা করতে বলে কলের মত করে যাই। লক্ষ্যহীন, উদ্দেশ্যহীন দিনগুলো কেমন ভাবে কাটত, তা বুঝতে পারতুম না,—বোঝবার কোন দরকারও ছিল না। সেই ব্যাপারের পর থেকে আমার উপর মোবারকের যত্ন যেন আরো বেশী বেড়ে গেল। আমার একটু অসুখ করলে সে অস্থির হয়ে পড়ত। আমার কিন্তু তার যত্ন একেবারেই সহ্য হ'ত না। আমি ভাবতুম, সংসারের আপনার লোকজন সব যখন আমাকে তাদের কাছ থেকে এমনি করে বিদেয়

দিয়েছে, একজন বাইরের লোক কেন আমায় বাঁধবার চেষ্টা করছে? সময়-সময় এমন হয়েছে, মাসাবধি আমি তার সঙ্গে কথা পর্য্যন্ত বলিনি। এমনি করে আমাদের দিন কাটতে লাগল।

বাড়ীর লোকেরা আমায় যেমন নিষ্ঠুর ভাবে তাদের কাছ থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল, আমিও ঠিক তেমনি করে বাইরের আকর্ষণগুলোকে তাড়াতে থাকতুম। আমার পালক প্রভু ছাড়া অন্য কেউ যদি আমার সঙ্গে কথা কইতে, কিম্বা আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করতে আসত, তাদের সঙ্গেও আমি সেইরকম ব্যবহার করতুম। ক্রমে এমন হল, কেউ আমার সঙ্গে কথা পর্য্যন্ত কইত না।

আমার বন্ধন ও মুক্তির মধ্যে একটা সূক্ষ্ম সংযোগ-তন্তু ছিল এই মোবারক। এই সময়ে একদিন আমাকে মুক্তির নির্ঝঞ্ঝাট আরাম উপভোগ করবার অবকাশ দিয়ে, আমার নিদারুণ শত্রু,—আমার একমাত্র সহায়, বন্ধু ও প্রতিপালক হঠাৎ পৃথিবী থেকে সরে পড়ল।

মোবারকের মৃত্যুর সঙ্গে-সঙ্গেই সংসারের সঙ্গে আমার বন্ধনের শেষ গ্রন্থিটাও ছিঁড়ে গেল। আমি যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলুম। সমস্ত পৃথিবীর বিরুদ্ধে যুদ্ধের নিশান উড়িয়ে দিয়ে আমি বেরিয়ে পড়লুম। দুনিয়ার কারো খবর আমি রাখতুম না, আমার খবরও বড়-একটা কেউ রাখত না। একদিন বাজী দেখিয়ে যা রোজগার করতুম, দশদিন ধরে বসে তাই খেতুম। পয়সা ফুরিয়ে গেলে আবার রোজগার করতে বেরোতুম।

কেমন করে' আমার এই উড়ো প্রাণটা আবার বাঁধনে ধরা দিল, সেই কথাটা এবার বলব। দেখলুম, একেবারে মুক্ত হওয়া বুঝি ভগবানের বিধান নয়। মানুষ মানুষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-যাত্রা করতে পারে বটে; কিন্তু সে সময় তাঁকেও আমার অগ্রাহ্য করবার স্পর্দ্ধা যে কেন হয়েছিল, তা আমি জানি না। আমার মনে হয়, মানুষই এর জন্য দায়ী।

একদিন বিকালবেলায় এই জায়গাটাতে বসে ছিলুম। সেদিন সকাল থেকেই, কেন জানি না, আমার মনটা বড় উতলা হয়েছিল। সে রকম অনুভূতি আমার সেই প্রথম। সেটা কি রকম, তা' ঠিক করে আমি বুঝিয়ে বলতে পারব না। পেটে ক্ষিধে পায় জানি; আমার ভাগ্য-ক্রমে সেটা আমাকে খুব বেশী করেই জানতে হয়েছিল। কিন্তু বুকেরও যে ক্ষিধে পায়, সেও যে খাবার জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠে—সেটা সেই দিনই প্রথম টের পেলুম। ভাবছিলুম, জীবনটা কেমন করে কাটল। এই কোলাহলময় পৃথিবীতে আমিই শুধু একা। যেখানে সবাই ভাই, বোন, আত্মীয়-স্বজন, প্রিয়তমদের নিয়ে সুখে গলাগলি হয়ে দিন কাটাচ্ছে, সেখানে আমারই শুধু আপনার বলবার কেউ নেই। ভাবতে-ভাবতে আমার নিঃসঙ্গ জীবনের একমাত্র সহচর এই নীরস ইটপাটকেলগুলোর মধ্যে এসে এক জায়গায় বসে পড়লুম।

কতক্ষণ এই রকম ভাবনায় বিভোর হয়ে বসে ছিলুম, জ্ঞান ছিল না। হঠাৎ কার গলার আওয়াজে আমার চমক

ভেঙ্গে গেল। দেখলুম, কয়েকটী ছোট-ছোট ছেলেমেয়ে আমার সামনে ছুটোছুটি করে খেলে বেড়াচ্ছে। তখন প্রায় সন্ধ্যে হয়ে এসেছে। আমার মনে হল, আকাশ থেকে একটা পৃথিবী জোড়া অন্ধকার নীচের দিকে নেমে আস্‌তে-আস্‌তে, হঠাৎ মাঝ পথে থম্‌কে দাঁড়িয়ে গেল। আমার বহুদিন-বিস্মৃত ছেলেবেলাকার কথাগুলো একে-একে মনে পড়তে লাগল। আমার রত্না, আমার ভাই, আমার সেই সব সহচর—কোথায় তারা?

তাদের ছুটোছুটি দেখে মনে হচ্ছিল, বুঝি আমার দমআট্‌কে-মারা সেই ছেলেবেলাটা এতদিনে সুযোগ পেয়ে, আমার বুকের ভিতর থেকে পালিয়ে গিয়ে আমার সামনে খেলতে আরম্ভ করেছে। আমি বর্ত্তমান হারিয়ে ফেললুম; তাদের সেই ছুটোছুটি, হাসির রোলে যোগ দেবার জন্য, আমি আমার জায়গাটা ছেড়ে, লাফিয়ে তাদের সঙ্গে খেলতে ছুটে গেলুম। আমাকে তাদের কাছে যেতে দেখেই, একটী ছেলে চেঁচিয়ে তার সঙ্গীদের সাবধান করে দিলে—"ওরে পাগলা—পাগলা, —পালিয়ে আয়।"

আচম্‌কা গালের উপর জোরে একটা চড় এসে পড়লে যে রকম অবস্থা হয়, তার কথা শুনে আমার সেই রকম অবস্থা হল। দেখলুম, তারা সবাই ছুটে আমার কাছ থেকে দূরে পালিয়ে গেল। তাদের কোলাহল আমার এই দুঃসহ, বিষাদপূর্ণ জীবনটা হঠাৎ এক নিমেষের জন্য আনন্দে পরিপূর্ণ করে দিয়ে

কোথায় মিলিয়ে গেল, বুঝতে পারলুম না। জ্ঞান ফিরে আসবার পর দেখতে পেলুম, দূরে স্মৃতি-সাগরের ওপারে আমার অতীত জীবনটা এই সুখ দুঃখ-মাখা সংসারের মধ্যে ফিরে আসবার জন্য দুহাত বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। উপরে চেয়ে দেখলুম, সন্ধ্যা-সুন্দরী অস্তরবির সোণালী পাড়ওয়ালা নীলাম্বরী পরে' পৃথিবীর সামনে এসে মোহন বেশে দাঁড়িয়েছে। চার-দিকে পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্যের মাঝখানে আমার এই জীবনটা নিষ্ফলে কেটে গেছে। এতদিন কি অন্ধ ছিলুম? কিসের মোহ আমাকে এই সুখ থেকে বঞ্চিত করে রেখেছিল? পূবের একটা দমকা বাতাস লেগে এই মৌন পাথরগুলো আমার দুঃখের সঙ্গে সুর মিলিয়ে একটা বিষাদের গান গেয়ে উঠল। আমি আস্তে-আস্তে একটা পাথরের উপর শুয়ে পড়লুম।"

* * * *

এই পর্য্যন্ত বলেই সে চুপ করল। আমি একমনে তার কথা শুনছিলুম। সে চুপ করতেই, তার দিকে চেয়ে দেখি, ততক্ষণে সে উঠে পড়েছে। আর একটী কথাও না বলে সে তাড়াতাড়ি সেখান থেকে চলে গেল।

সামনে চেয়ে দেখলুম দিনান্তের নিভন্ত চিতার শেষ রশ্মিটা তখনও কুতবমিনারের চূড়ার উপর ধ্বক্-ধ্বক্ করে জ্বলছে। পূর্ব্বদিক থেকে একটা বিরাট অন্ধকার পাখা মেলে সেই আলোটুকুকে গ্রাস করবার জন্য ছুটে আসছে।

নিশির ডাক

সে একদিন দেবতার খেয়ালে দুপুর বেলাতেই সন্ধ্যা নেমেছিল। ক'দিন থেকেই আকাশটা মেঘলা মেঘলা করে ছিল, সেদিন চারদিককার যত মেঘ জড় হয়ে সহরটার ঠিক উপরেই একটা কালো চাঁদোয়া খাটিয়ে দিলে। দুপুর বেলাতেই মনে হতে লাগ্‌ল, যেন সন্ধ্যা হয়ে এসেছে।

সেদিন ছিল রবিবার। তাড়াতাড়ি খাওয়া-দাওয়া সেরে আমরা বৃষ্টি নামবার আগেই গুপীনাথের দরবারে আসর জমিয়ে বসেছিলুম।

আমাদের মধ্যে ঘোর তর্ক চল্‌ছিল যে মৃত্যুর পরে মানুষ আবার ফিরে আস্‌তে পারে কি না, আর এলেও তারা জ্যান্ত মানুষের কোন ক্ষতি কিংবা ভাল করতে পারে কি না?

তর্কটা ওঠবার কারণ হচ্ছে আমাদের পাড়ায় একজনদের বাড়ীতে ভীষণ ভূতের উপদ্রব চল্‌ছিল। এক ভদ্রলোক স্ত্রী মারা যাবার মাস দুই যেতে না যেতে আবার একটী বিবাহ করেছিলেন এবং সেই প্রথমা স্ত্রী দ্বিতীয়ার উপর যৎপরোনাস্তি অত্যাচার আরম্ভ করেছেন। মহিলাটী খেতে শুতে কোন কাজে সোয়াস্তি পাচ্ছেন না।

ব্যাপারটা যে কি তা আমরা অবশ্য কেউ প্রত্যক্ষ করিনি। তার কারণ আমরা এ-সব বিষয় প্রত্যক্ষ না করেই বিশ্বাস করতে রাজী ছিলুম।

গুপীনাথ কিন্তু এ-সব ভৌতিক ব্যাপার একবারেই বিশ্বাস করতে চায় না, সে বলে, ও সব ভূয়ো কথা। আমরা সকলেই এক-একঠা শোনা ভূতুড়ে কাণ্ডকে নিজেদের অভিজ্ঞতা বলে চালিয়ে দেবার চেষ্টা করছিলুম, গুপীনাথ নির্ব্বিকার ভাবে সেগুলোকে "আমি ও-সব বিশ্বাস করি না" বলে উড়িয়ে দিতে লাগল।

নিশিকান্ত এতক্ষণ একধারে বসে একটা বড় তাঁওয়া-দেওয়া কল্‌কের সদ্ব্যবহার করছিল। সুখ-টানটী মেরে সে একটু এগিয়ে এসে বল্লে—"আচ্ছা, আমার একটা অভিজ্ঞতার কথা বলি, তার উপরে যদি কলম চালাতে হয় ত চালিয়ো।"

নিশিকান্ত বলতে লাগল,—"জন্মাবধিই বিধাতা আমাকে বেশ সুনজরে দেখতে আরম্ভ করেছিলেন। বারো বছর পেরোতে না পেরোতে আমার বাপ, মা, আত্মীয়-স্বজন যে যেখানে ছিল একেবারে মরে হেজে সব সাফ হয়ে গেল। আমার আজকের অবস্থা দেখে তখনকার বিচার কেউ করোনা, এখন যদি আমার নাইতে খেতে একটু বেলা হয়ে যায় ত অন্ততঃ পঁচিশটী লোক আমার জন্য হায়-হায় করতে থাকে। কিন্তু সেদিন, সেই বারো বছর বয়সে দুনিয়ার এমন কেউ ছিল না যে আমায় ডেকে জিজ্ঞেস করে, "তোর খাওয়া হয়েছে কি না?"

আমাদের পাড়ায় একজনদের বাড়ীতে একটী বাঙ্গালী চাকর ছিল, তার নাম অমৃত, তার সঙ্গে আমার বড় ভাব ছিল।

সে আমায় একদিন পরামর্শ দিলে—দেখ, গেঁয়ো যোগী ভিখ্ পায় না, তুমি এখান থেকে অন্য জায়গায় গিয়ে কাজকর্ম্ম করবার চেষ্টা দেখ, বিদেশে গেলে চাকরী কি ব্যবসা যা হয় একটা সুবিধে লেগে যেতে পারে।

সুবিধে লাগবার আশায় আমি সেই দিনই ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়লুম্। তারপর প্রায় দশটা বছর এদেশ সেদেশ ঘুরে সুবিধে ত লাগ্‌লোই না, উল্টে এই ঘোরাটাই আমার একটা রোগ দাঁড়িয়ে গেল। এই রোগের ঠেলায় কখনো আমি এক জায়গায় স্থির হয়ে থাকতে পারতুম না। একদিন এখানে, একদিন সেখানে চাকরী করে, বাসন মেজে, কখনো বা ভাড়াটে গাড়ীর গাড়োয়ানের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে সহিসের কাজ করে আমার দিন কাট্‌তে লাগ্‌ল। আবার হাতে কিছু পয়সা এলে সেই দিনই সেখান থেকে সরে পড়তুম।

এই ঘূর্ণী রোগ ঘোরাতে ঘোরাতে আমায় একদিন রাজপুতানার মরুভূমির মধ্যে এনে ফেল্লে।

রাজপুতনায় অন্য দেশের মত পয়সা রোজগারের সুবিধে মোটেই নেই, সেখানকার সবারই অবস্থা প্রায় আমার মত। কাজ দেবার চেয়ে কাজ করবার মত লোকই সেখানে বেশী। শুনেছিলুম, আমাদের দেশের এক কালী সেখানে আছেন। ইচ্ছে হল, একবার তাঁকে দেখে যাই। বাঙ্গলার সম্পদ ছেড়ে এই ভিখিরীর দেশে তিনি কি সুখে পড়ে আছেন, সেইটে দেখে যাবার উদ্দেশ্য ছিল, কিন্তু এই দেবতা দেখতে যাওয়াই

আমার কাল হয়েছিল। ছেলেবেলা থেকে দেবতাদের সঙ্গে আমার যেমন বনিবনা, সেইটে বুঝে না গেলেই চল্‌ত,—কিন্তু তখন ততটা খেয়াল হয়নি।

সন্ধ্যার ঝোঁকে মন্দিরের দরজার কাছে গিয়ে হাজির হলুম। তখন দেবীর আরতি চলেছে। কাঁচা চামড়া আর কাঁসা পিটে যতটা আওয়াজ করা সম্ভব তা হচ্ছে। লোকজন অনেক জড় হয়েছে; স্ত্রীলোকের সংখ্যাও বড় কম নয়। কিন্তু তাদের দেখে মনে হলো, তারা যেন এ ভিখিরীর রাজ্যের লোক নয়। সবাই হাত যোড় কোরে এক দৃষ্টে দেবীপ্রতিমার দিকে তাকিয়ে আছে। আর থেকে থেকে তাল-মাফিক বিকট একটা চীৎকার করে আবার নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এই রকম প্রায় ঘণ্টা খানেক ধরে আরতি চল্‌ল; তারপর একে একে সবাই দেবীকে প্রণাম করে যে যার ঘরে চলে গেল। আমি একলা মন্দিরের সাম্‌নে চাতালটাতে বসে বসে ভাব্‌তে লাগলুম—আজকের দিন ত গুজরান হয়ে গেল।

মনে হচ্ছিল, এই সব বড় লোকদের মধ্যে যদি কেউ আমাকে এখান থেকে ডেকে নিয়ে গিয়ে তার অগাধ সম্পত্তির মালিক করে দেয় ত মন্দ হয় না। ভিতর থেকে আর একজন বলে উঠলেন—দূর, তাও কখনো হয়?

যিনি কথাটা প্রস্তাব করেছিলেন, তিনি অম্‌নি মাথা নাড়া দিয়ে বল্লেন—কেন হয় না, এ রকম যে একেবারে কখনো হয় নি, এমনো ত নয়।

ভাব্তে ভাব্তে রাত বাড়তে লাগল, পুরুত এসে আর একবার কি সব মন্তর আওড়ে প্রতিমার ঘরের দরজায় চাবি লাগিয়ে চলে গেল।

রাত্তিরের ডাক তোমরা কেউ শুনেছ ? হাঁ, রাত্তির ডাকে। সে একটা অখণ্ড আওয়াজ, ঝাঁ—ঝাঁ—ঝাঁ—ঝাঁ—আবার মধ্যে মধ্যে সেটা গুম্ হয়ে বাজতে থাকে, ঝম্—ঝঝম্—ঝম্। একমনে শুনতে শুনতে মনে হয়, যেন রাত্তির ডাক্‌ছে—আয়, চলে আয়, আমার এই নিবিড় কালো অন্ধকারের বুকে লুকিয়ে খেল্‌বি যদি আয়। আমি মন্দিরের চাতালে একলা পড়ে পড়ে সেই রাত্তিরের ডাক শুনতে লাগলুম।

একমনে এই ডাক শুনছি, হঠাৎ যেন মনে হল, সেই জমাট ঝাঁ ঝাঁ আওয়াজের মধ্যে থেকে একটা মিঠে আওয়াজ ফুটে উঠেছে ! আস্তে আস্তে সে আওয়াজটা যেন স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগ্‌ল। যেন দূরে কে নুপুর পায়ে দিয়ে যাচ্ছে।

ঘুঙুরের আওয়াজ অনেক শুনেছি, কিন্তু এ যে তার চেয়ে কত মিঠে, তা যে না শুনেছে সে বুঝতে পার্‌বে না। কিছুক্ষণ শুন্‌তে শুন্‌তেই সেই অজানার প্রত্যেক চরণ-বিক্ষেপের তালে তালে আমার বুকের ভিতরটা নাচতে সুরু করলে। তার প্রতি চরণ-ক্ষেপে এমন একটা সুর, এমন একটা মিঠে রাগিণী বেজে উঠ্‌ছিল যে তার চলনের লীলায়িত ভঙ্গী আমার চোখের সাম্‌নে জেগে উঠতে লাগল। মনে হলো, বোধ হয় কোন বড় ঘরের মেয়ে এই রাত্রির ডাক শুন্‌তে পেয়ে অভিসারে বেরিয়ে

পড়েছে। একবার ভাবলুম, পেছু নেব নাকি? আবার মনে হল—কাজ কি বাবা! গরীবের ছেলে শুয়ে পড়—শুয়ে পড়, মনটা যদি বেশী উতলা হয় ত মাথা অবধি চাদরটা টেনে দাও।

মাথার উপর ত চাদর টেনে দিয়ে শুয়ে পড়া গেল। কিন্তু মনের উপর যেই চাদর মুড়ে দেবার চেষ্টা করি, অমনি সেই নূপুরের আওয়াজ যেন চাদরের একটা খুঁট তুলে ধরে বলতে থাকে—কোথায়? দেখি—দেখি, অত লজ্জা কিসের?

আওয়াজটা ক্রমেই মন্দিরের কাছে এগিয়ে আসতে লাগল, শেষে আর পারলুম না, মাথার চাদর তুলে ধড়মড়িয়ে উঠে পড়লুম। উঠেই দেখি, আমার সাম্‌নে একটু দূরে এক সুন্দরী এসে দাঁড়িয়ে আছে। রাজপুতানার কাটখোট্টা বুকে এমন গোলাপ জন্মায় দেখে সত্য-সত্য আমার দেশটার উপর ভক্তি হতে লাগল। দূর থেকে দেখলুম, সুন্দরীর সন্ন্যাসিনীর বেশ, গেরুয়া রংয়ের কাপড়ে তার শরীর ঢাকা, হাতে একটা বড় গোছের চিম্‌টে। বুঝলুম, যেটা এতক্ষণ নূপুর হয়ে আমার বুকের মধ্যে নাগরদোলার তোলপাড় লাগিয়েছিল, সেটা আসলে নূপুরই নয়। মনে হলো, রাজপুতানা কি যাদুকরের দেশ বাবা! চিমটে বাজাবার বাহাদুরী আছে, বটে!

ভৈরবী আমার দিকে আস্তে আস্তে এগিয়ে আস্‌তে লাগল। দু' এক পা চল্‌তে না চল্‌তেই বুঝলুম, কৈ, এ ত চিম্‌টের আওয়াজ নয়! ঐ ত পায়ে পায়ে বাজ্‌ছে রিণি ঝিণি, রিণি

ঝিণি—নিজেকে তারিফ করে বল্লুম—আমার দ্বারা এত বড় ভুল হওয়াও কি সম্ভব ? যা মনে করেছি, তা না হয়ে আর যায় না।

সুন্দরী পায়ে পায়ে একেবারে আমার সম্মুখে এসে দাঁড়াল। তার দিকে চেয়ে দেখে বুঝতে পারলুম, দূর থেকে তার উপর অবিচার করা হয়েছে, সে সুন্দরী নয়—অপরূপ সুন্দরী। সৌন্দর্য্যের দেবী বল্লেও তার রূপের বোধ হয় ঠিক বিচার করা হয় না। তার পাৎলা গেরুয়া কাপড়ের ভিতর দিয়ে লাল মখমলের পেশোয়াজ দেখা যাচ্ছে, পেশোয়াজের উপরকার সাঁচ্চা জরির সলমা-চুম্‌কীর কাজগুলো সেই গেরুয়া রংয়ের উপর ঝিলিক মার্‌তে লাগল। নিটোল বুক বহুমূল্য কাঁচুলী দিয়ে ঢাকা। কাঁচুলীর পর থেকে নীবি-বন্ধনের সীমা অবধি অনাবৃত দেহের বর্ণ বিদ্যুতের মত ঠিকরে এসে আমার চোখকে ধাঁধিয়ে দিতে লাগ্‌ল। একে এই রাজকুমারীর মতন বেশ-ভূষা, তার উপর সর্ব্বাঙ্গ গৈরিক বসনে ঢাকা, হাতে চিমটে ইত্যাদি দেখে মনে হলো নিশ্চয়ই সে অভিসারে বেরিয়েছে। কিন্তু অভিসারেই যদি বেরুবে, তবে পায়ের পাঁয়জোর খুলে আসেনি কেন ? আমার মনের ভিতর কি রকম যেন ভয়-ভয় করতে লাগল।

ভৈরবী মাথা নীচু করে আমার দিকে আরো অগ্রসর হতে লাগল। এবার সে এত ধীরে ধীরে পা ফেল্‌তে লাগ্‌ল যে আমার মনে হল মাটিতে তার পা ঠেকছে না। ঠিক যেন প্রথম-প্রণয়-ভীতা সলজ্জ বধূ দয়িতের গৃহপানে ধীরে ধীরে

এগিয়ে চলেছে। মনে হল, দেখা যাক্. কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়! আমি স্থির হয়ে বসে রইলুম।

ততক্ষণে সে আমার পাশে এসে বসে পড়েছে। খানিকক্ষণ মাটির দিকে চেয়ে চেয়ে হঠাৎ সে মুখ তুলে আমার দিকে চাইলে। ওঃ. কি সে করুণ দৃষ্টি! জন্ম-জন্মান্তরেও আমি সে চাহনি ভুলতে পারব না। সে চাহনির স্পর্শে আমার বুকের ভিতরটা একেবারে হিম হয়ে যেতে লাগ্‌ল। আমার কি রকম যেন অস্বস্তি বোধ হতে লাগল। একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে সে বল্লে—তবু যাহোক মনে পড়েছে!

—মনে পড়েছে!!! এ বলে কি? কার কথা বলছে?

সে আবার বল্লে—কি, কথা কইবে না? অভিমান হয়েছে?

কোন্ পাষণ্ডকে ভ্রম করে এ কথা কাকে বল্‌ছে সুন্দরী? —হায়, হায়,—সত্য সত্যই আমি যদি সে-ই হতুম!

ভৈরবী আবার বল্লে—ওগো বলনা, কতদিন—কতকাল আর এমনি করে কাট্‌বে? আমাদের কি মিলন হবেনা? এবার সে আমার একখানা হাত চেপে ধরলে।

আমি আর থাকতে পারলুম না। মুখ ফুটে বলে ফেল্লুম—সুন্দরী, আপনার ভ্রম হয়েছে; আপনি যাকে মনে করেছেন আমি সে ভাগ্যবান নই।

ভৈরবী একটু হেসে বল্লে, বাঃ! বেশ কথা বলতে শিখেছ তো! আমার ভুল হচ্ছে? আচ্ছা, দেখ দিকিন এটা চিন্‌তে

পার কিনা ? এই বলে তার ডান হাতখানা আমার হাতের উপর ধরলে। তার হাতের আঙ্গুলে একখানা বড় হীরের আংটি ঝক্ ঝক্ করছিল, সেটাকে দেখিয়ে বল্লে—এ আংটি কার ?

সর্ব্বনাশ আর কি ! একটা রূপোর দোয়ানী হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করবার আশা যার তখন নিতান্ত দুরাকাঙ্ক্ষা হয়ে দাঁড়িয়েছে, তার কাছে সেই জ্বল্‌জ্বলে হীরের আংটি—অদৃষ্টের বিড়ম্বনা না হলে আর এমন হয় ! চুপ করে ভাবতে লাগলুম —কি বলা যায়। আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে সে বল্লে কেমন, চিনেছো ত ? আমি বল্লুম—আমায় মাপ করবেন ! আমি কিছু বুঝতে পারছি না, একটু খুলে বলুন।

—আবার সেই দীর্ঘ ইতিহাস খুলে বলতে হবে ? ভৈরবী আর একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেল্লে। আমার মনে হল, যেন সেই নিশ্বাসের বাতাসে তার দুঃখের বোঝাটা সেই খানেই জমাট বেঁধে স্থির হয়ে মাটিতে পড়ে রইল।

—আর সে সব কথা বলবার আমার ধৈর্য্য নেই। আচ্ছা আমার সঙ্গে এস, যদি তোমার কিছু মনে পড়ে ত দেখি !

কৌতূহল ক্রমেই বাড়তে লাগল। কোথায় দিন-ভিখারী আমি,—আমার উপর আজ একি সৌভাগ্য-বৃষ্টি ঝরতে আরম্ভ হয়েছে ! মনে মনে বল্লুম, ভগবান তুমি আছ, নইলে আমার উপর কে এমন করে সৌভাগ্য ঢেলে দেবে। কি জানি কেন চট্ করে এতদিন পরে অমৃতের কথা মনে পড়ে গেল। মনে

মনে তাকে অজস্র ধন্যবাদ দিয়ে বল্লুম—জিতা রহো বাবা অমর্ত্ত, ঠিক বলেছিলি—গেঁয়ো যোগী ভিখ পায় না, এবার দেশে ফিরে গিয়ে নিশ্চয় তোকে বালাখানা বানিয়ে দেবো।

চুপ করে আছি দেখে সুন্দরী বল্লে—কি গো ভয় হচ্ছে? তার কথা শুনে আমার চমক ভাঙ্‌ল—আমি বল্লুম—ভয়! সুন্দরী তোমার সঙ্গে যদি যমের বাড়ীও যেতে হয় ত আমি সুড় সুড় করে চলে যাব। তড়াক করে উঠে বল্লুন—চল; কোথায় যেতে হবে।

ভৈরবী বল্লে—আমার হাত ধর। আমার হাত ধরে সে অগ্রসর হতে লাগ্‌ল। ছু'-এক পা চলতেই আমার পা দুটো যেন মাটি থেকে উপরে উঠে পড়ল, আমরা শূন্যের উপর দিয়ে শাঁ শাঁ করে ছুটতে লাগলুম। মাটিতে পা লাগচে না অথচ সেই রকম ঠুমকি চালে তার পায়ের পাঁয়জোরের আওয়াজ হতে লাগল।

তাজ্জব করলে দেখছি! নিশ্চয় কোনো হুরীর পাল্লায় পড়েছি। এর সবই দেখি উল্টো রকমের, আচ্ছা যখন সুরু করা গেছে, তখন এর শেষ পর্য্যন্ত না দেখে ছাড়চি না।

শন শন্ করে আমরা রাত্রির অন্ধকারের মধ্য দিয়ে ছুটে বেরিয়ে যেতে লাগলুম। সহর ছাড়িয়ে অনেক দূরে এসে একটা পোড়ো বাড়ীর সামনে এসে সে আমার হাত ছেড়ে দিলে, হাত ছাড়তেই দেখি আমি মাটির উপর দাঁড়িয়ে রয়েছি।

ভৈরবী বাড়ীটা দেখিয়ে বল্লে—কেমন, মনে পড়ে এই বাড়ী ?

—কৈ না, কিছুই ত মনে পড়ছে না।

—আচ্ছা, ঐ গাছটার কথা মনে পড়ে ?

দূরে যেন একটা ঘন অন্ধকার আকাশের দিকে কতকগুলো হাত বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। এত আঁধার সে জায়গাটা যে রাত্রির অঁন্ধকারেও সেটা বেশ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। আমি বল্লুম—কৈ, না।

তবে চল—বলে সে আবার আমার হাত ধরলে। আবার আমরা সেই রকম করে আর এক দিকে এগিয়ে চলতে লাগলুম। এবার খানিকক্ষণ পরে আমরা একটা বড় প্রাসাদের সাম্নে এসে দাঁড়ালুম। প্রাসাদের প্রকাণ্ড ফটকে ক'জন প্রহরী পাহারা দিচ্ছে, আমরা তাদের সাম্নে দিয়ে ফটক পেরিয়ে ভিতরে ঢুকে পড়লুম কিন্তু তারা আমাদের দেখতে পেলে না। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলুম—এটা কার বাড়ী ?

—তোমার।

একটু রসিকতা করে বল্লুম—বহুৎ আচ্ছা, কিন্তু এই অনুগ্রহ মনে রেখো সুন্দরী, কাল সকালে আবু হুসেনের মত আবার পাগলা-গারদে ঠেলো না যেন।

তারপর আমরা বড় বড় ঘর পার হয়ে যেতে লাগলুম, এক একটা ঘরে হাজার ডালের এক একটা বেলোয়ারী ঝাড় জ্বলছে —আলোয় আলো! তিন চারটে ঘর পেরিয়ে আমরা একটা ঘরে

এসে দাঁড়ালুম। ঘরের মাঝখানে একটা রেশমী পরদা টাঙ্গান ছিল। আমরা সেখানে যেতেই পরদাটা সট্ করে সরে গেল। দেখলুম ঘরের মধ্যে উঁচু বিছানায় একটা তাকিয়ায় হেলান দিয়ে আমি বসে রয়েছি, আর পাশে রয়েছে এই ভৈরবী, যার হাত ধরে দাঁড়িয়ে আমি এই দৃশ্য দেখ্‌চি। আমার একটা হাত সুন্দরীর গলাটা জড়িয়ে ধরেছে, আর একটা হাত তার চিবুক তুলে ধরবার চেষ্টা করছে। যেন—প্রেয়সী রাগ করেছ? এই ভাব আর কি।

তারপর প্রতি ঘরে ঘরে সে আর আমি, কোথাও বসে গল্প করছি, কোথাও দুজনে পাশা খেল্‌ছি, কোন ঘরে সে বসে গান গাইছে, আমি তন্ময় হয়ে শুন্‌ছি, কোথাও বা কোন অলিন্দে বসে বসে আমি প্রেমের কবিতা পড়ছি সে শুন্‌ছে। দেওয়ালে দেওয়ালে আমাদেরই দুজনকার ছবি, প্রাসাদের সর্ব্বাঙ্গে যেন সে আর আমি, আমি আর সে।

অনেকক্ষণ ধরে এই দৃশ্য দেখে আমরা প্রাসাদের বাইরে চলে এলুম। বাইরে এসে সে আমায় জিজ্ঞেস্ করলে,—এবার বুঝতে পেরেছ?

আমার মনের অবস্থা তখন যে কি রকম দাঁড়িয়েছিল, তা আমি বর্ণনা করতে পারব না। আমি তাকে বল্লুম—সুন্দরী, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না, অথচ মর্ম্মান্তিক কৌতুহলে আমি জর্জ্জরিত হয়ে উঠেছি, আমায় সব খুলে বল। নইলে এই দণ্ডে তোমার সামনে আমি আত্মঘাতী হব।

—বটে—বলে সে আমার হাত ধরে একটা বড় জলাশয়ের ধারে নিয়ে গেল। কালো কুচকুচে সেই জলের বুকে পদ্মের মতন শাদা একটা ধবধবে বাড়ী দেখিয়ে বল্লে—এটা রাণা উদয় সিংহের প্রাসাদ, আর এই দীঘিকে লোকে উদয়সাগর বলে। সেই দীঘি আর সেই প্রাসাদের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হয়ে চারি দিকে তাকিয়ে দেখছি, এমন সময় সে আমার একটা হাত ধরে বসতে বল্লে। আমি বসে পড়লুম, সে আমার পাশে বসে বলতে লাগল—

ঐ যে পোড়ো বাড়ীটা, যেখানে প্রথমে তোমায় আমি নিয়ে গিয়েছিলুম, সেটা এক রাঠোর সর্দ্দারের বাড়ী। ঐ সর্দ্দারের এক নাত্নী ছিল, তার নাম ছিল সম্পা। সম্পার মতনই তার দেহের বর্ণ আর সম্পার মতই সে চঞ্চল ছিল, তাই সর্দ্দার তার ঐ নাম রেখেছিলেন। ছেলে বেলাতেই মেয়েটীর বাপ-মা দুই মারা যায়। বৃদ্ধ সর্দ্দার তাকে নিজের হাতে মানুষ করে তুলেছিলেন। সংসারে বৃদ্ধের ঐ নাত্নীটী ছাড়া আর কেউ ছিল না।—এই বলে ভৈরবী একটুখানি চুপ করলে! তারপর আবার সে বল্‌তে লাগল,—সর্দ্দার যৌবনে রাজার সেনা-নায়ক ছিলেন, বয়স হলে কাজ থেকে অবসর নেবার পরও রাজার অনুগ্রহ থেকে তিনি বঞ্চিত হন নি। বৃদ্ধ প্রায়ই তাঁর নাত্নীকে নিয়ে রাজার প্রাসাদে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যেতেন। মেয়েটী দেখতে খুব সুন্দরী ছিল বলে রাজ-অন্তঃপুরের সকলেই তাকে খুব ভালবাস্‌ত। সর্দ্দার প্রাসাদে গেলেই নাত্নিটীকে অন্তঃপুরে

পাঠিয়ে দিত। কখনো কখনো দু' একদিন সে অমন অন্তঃপুরেই থাকত কিন্তু বৃদ্ধ সর্দার তার সংসারের শেষ অবলম্বনটীকে ছেড়ে বেশী দিন থাকৃতে পারতো না—কাজেই দু' একদিন যেতে না যেতে আবার তাকে সে বাড়ী ফিরিয়ে নিয়ে যেত।

রাজার একমাত্র ছেলে, ভবিষ্যতে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী অরুণের সঙ্গে এই মেয়েটীর বড় ভাব হয়ে গেল। সম্পা যখনি প্রাসাদে আসৃত, রাজপুত্র তার সঙ্গে খেলা করত, তাকে ছাড়তে চাইত না। যাবার সময় দুজনে দু'জনকে জড়িয়ে ধরে থাকৃত। আসন্ন বিচ্ছেদের আশঙ্কায় তাদের দু'জনেরই চোখ জলে ভরে উঠ্‌ত।

এমনি করে দুজনকার বয়স বাড়তে লাগ্‌ল। শিশুর ভলোবাসা শেষে যৌবনে প্রেমে পরিণত হল। অবশ্য এদের এই প্রেমের কথা আর কেউ জানতো না। এখন দুজনে আর সে রকম করে খেলবার কিম্বা মেশবার অবসর পেতো না বটে, কিন্তু সম্পা প্রাসাদে এলেই অরুণ ছল করে সহস্র আমোদ ফেলে অন্তঃপুরে ছুটে আসত। গোপনে তাদের দেখা-শোনা আর প্রেমালাপ চল্‌ত।

সর্দার যখন কোন কাজে বাড়ী ছেড়ে বাইরে যেত, অরুণ ঘোড়ায় চড়ে সম্পাদের বাড়ী যেত। দূরে একটা বটগাছে তার ঘোড়াটাকে বেঁধে রেখে সে লুকিয়ে সম্পার সঙ্গে দেখা করত। এমনি করে তারা দিনে দিনে নিবিড়তর বন্ধনে

আপনাদের বাঁধ্‌তে লাগল। শেষে এমন হল, একজন আর একজনকে ছেড়ে একদণ্ড থাক্‌তে পারতো না।

ব্যাপার যখন এতদূর এসে দাঁড়িয়েছে তখন কানাঘুষা হতে হতে কথাটা রাণা ও সর্দ্দার দুজনেরই কাণে উঠ্‌ল। রাজপুত্রের সঙ্গে সর্দ্দারের মেয়ের বিবাহ রাণা কিছুতেই অনুমোদন করবেন না, এটা সর্দ্দার জানতেন। তিনি তাঁর নাত্নীকে রাজপুত্রের সঙ্গে বেশী ঘনিষ্ঠতা করতে বারণ কোরে দিলেন। সেইদিন থেকে সম্পার প্রাসাদে যাওয়া একেবারে বন্ধ হোয়ে গেল।

কিন্তু তখন আর এ সব প্রতিবন্ধকে বাধা মানবার সময় ছিল না। অরুণ আর সম্পা গোপনে দেখা করে ঠিক করে ফেল্লে, একদিন রাত্রে অরুণ এসে সম্পাকে তার বাড়ী থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে গিয়ে বিবাহ করবে। তারপর একদিন রাজপুত্র মৃগয়া যাবার ছল করে প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে সন্ধ্যার অন্ধকারে সর্দ্দারের বাড়ী অন্ধকার করে সম্পাকে নিয়ে পালিয়ে গেল।

ব্যাপারটা কিন্তু বেশীদিন চাপা রইল না। একমাস যেতে না যেতেই রাণা ও সর্দ্দার দু'জনেই টের পেলেন যে রাজপুত্রই এই কাণ্ড করেছে। রাণা উপযুক্ত লোক পাঠিয়ে সম্পাকে প্রাসাদে নিয়ে এলেন। অরুণ রাজাকে জানালেন যে সে সম্পাকে বিবাহ করতে চায়। রাণা বল্লেন, তা হতে পারে না, সর্দ্দারের মেয়েকে রাণার ছেলে কখনো বিবাহ করতে পারে না, তা ছাড়া সর্দ্দার জাতিতে রাণা-বংশ অপেক্ষা হীন, এক্ষেত্রে কি করে বিবাহ সম্ভব?

রাণা সম্পাকে বাড়ীতে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্য সর্দ্দারকে অনুরোধ করে পাঠালেন কিন্তু তিনি আর তাকে গৃহে স্থান দিলেন না, রাণাকে বলে পাঠালেন, যে-কন্যা কুলত্যাগ করে বাড়ী ছেড়ে চলে গিয়েছে, তাকে আর তিনি গৃহে স্থান দিতে পারেন না। এই অপমানের বোঝা বৃদ্ধকে আর বেশীদিন বইতে হয় নি, এ ঘটনার কিছুদিন পরেই বৃদ্ধ বীর এ নশ্বর দেহ ছেড়ে স্বর্গে চলে গেলেন।

পরের মেয়েকে নিয়ে রাণা মহা বিপদে পড়ে গেলেন। তার সঙ্গে রাজকুমারের বিবাহ দিতে পারেন না, অন্য জায়গায় বিবাহ দেবার ব্যবস্থা করলে সে আত্মহত্যা করতে চায়। এই সব ব্যাপারে তিনি বড় বিব্রত হয়ে উঠ্‌লেন। শেষে অনেক চিন্তার পর তিনি সম্পাকে ব্রহ্মচর্য্য নিতে উপদেশ দিলেন।

রাণার আদেশে সেইদিন থেকেই রাজপুরোহিত এসে সম্পাকে ধর্ম্ম শিক্ষা দিতে আরম্ভ করলেন। বহুমূল্য পেশোয়াজ, অঙ্গের অলঙ্কার খুলে তাকে যৌবনে সন্ন্যাসিনীর বেশ ধারণ করতে হল।

বিলাসের সজ্জা খুলে ফেলে সে গৈরিক বসনে দেহ আবৃত করলে বটে, কিন্তু তার বুকের রাজ্য জয় করে যে প্রেমের নিশান পুঁতে গিয়েছিল তাকে সে কোন মতে ভুলতে পারলে না! গুরু এসে যখন বোঝাতেন—এ সংসার অনিত্য, এই পৃথিবী, তরুলতা, আকাশ, কানন সবই তাঁর সৃষ্টি, এর মধ্যেই তাঁকে অনুসন্ধান কর, তাঁর রূপ ধ্যান কর, দেখতে পাবে। সে একমনে দূরের

শ্যামল বনের দিকে চেয়ে থাকত, উপরে আকাশের দিকে চাইত। তার ফুলে ফলে তরুলতায়, আকাশে, বাতাসে, গ্রহ-তারায় দিকে দিকে অরুণেরই মূর্ত্তি আরও স্পষ্টতর হয়ে ফুটে উঠতে লাগল। তার প্রেমের শিখায় যতই শাস্ত্রের বোঝা চাপান হতে লাগল, সে আগুন গুম্‌রে গুম্‌রে ততই অন্তর্মুখী হয়ে তার ভিতরটাকে পুড়িয়ে ছারখার করে দিতে লাগ্‌ল।

অরুণ তার সঙ্গে দেখা করবার জন্য নিয়ত চেষ্টা করত, কিন্তু রাণার আদেশে সেখানে প্রহরীর এমন কড়া ব্যবস্থা ছিল যে তার মহলে কোন রকমে পুরুষ প্রবেশ করবার যো ছিল না।

রাজকুমারের তবুও মনটাকে অন্য দিকে দেবার নানা রকম উপায় ছিল। রাণার হুকুমে তাকে তখন দরবারে বস্‌তে হত, মৃগয়ায় যেতে হত, কখনো বা সৈন্যদের সঙ্গে কুচ করতে হোত, এমনি কোরে তার অধিকাংশ সময় কেটে যেত, কিন্তু সে অভাগিনীর দিনে রাতে অন্য চিন্তা ছিল না। কাজের মধ্যে ছিল তার শাস্ত্র পাঠ, কিন্তু বই খুললেই ছত্রে ছত্রে সে অরুণের নাম দেখতে পেত। কতদিন সে গুরুর সামনে পড়তে পড়তে তার নাম করে ফেলেছে। গুরুর কঠিন নির্ম্মম দৃষ্টি বজ্রের মত তার চোখের উপর গিয়ে পড়তে আরম্ভ করেছে।

এমনি করে রাজা ও রাজ্য এই দুটো প্রাণীর প্রেমের মাঝখানে দাঁড়িয়ে নিষ্ঠুরভাবে তাদের অস্ত্র চালিয়েছে আর ক্রমাগত তারা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে—দু'জনে মিলে নয়—একা—একা।

তাদের সেই অতৃপ্ত বাসনা ক্রমে রাজ্যকে ছারেখারে দিতে আরম্ভ করলে। তাদের অভিশম্পাতে রাণার রাজ্য যায়-যায় হয়ে উঠল। তবুও তিনি অটল হয়ে রইলেন। তাদের দু'জনের অতৃপ্ত কামনা ঐ প্রাসাদের শিরায় শিরায় প্রত্যেক পাথরের সঙ্গে গাঁথা হয়ে রয়েছে।”

এই অবধি বলেই ভৈরবী একবার চুপ করলে।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, তারপর?—তারপর—তারপর এক-দিন রাজপুত্র মৃগয়া কোরতে গিয়ে বন্য জন্তুর কবলে প্রাণ হারালেন।

আমি শিউরে উঠে বললুম—অপঘাত! আচ্ছা, তারপর সম্পা কি করলে?

—সে? সে আর কি করবে! তার কি অন্য গতি ছিল? তাদের মিলনের একমাত্র উপায় সে দেখতে পেলে—মৃত্যু—। হয়ত জীবনে যাকে পায় নি, মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে তাকে পেতে পারে, এই মনে করে একদিন রাত্রে এই উদয়-সাগরের জলে ঝাঁপ দিয়ে সে আত্মহত্যা করলে।

এই উদয়-সাগরের জলে যখন সে আত্মহত্যা করতে আসে, তখন এক সন্ন্যাসী তাকে বলেছিল—তোর মৃত্যুর পর কোন জন্মে কোন সময়ে যদি তোর প্রণয়ীর দেখা পাস্ ত তাকে এই উদয়সাগরের জলে তোর মত আত্মহত্যা করতে বলিস। তোর সুমুখে যদি সে এইখানে ডুবে মরে, তবেই তুই তাকে পাবি, নচেৎ নয়।” এই বলে সে আঙ্গুল বাড়িয়ে আমাকে সেই কালো জলের দিকে কি যেন দেখাতে লাগল।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সে আবার বল্‌লে, জন্ম জন্ম ধরে আমি তোমার জন্য এই সাগরের ধারে বসে আছি, কখন তুমি আস্‌বে, কখন তুমি এই সাগরের জলে লাফিয়ে পড়বে! আমি এই জায়গাটার চারপাশ ছেড়ে কোথাও যেতে পারিনা, ভয় হয়, যদি কখনো তুমি আমায় খুঁজতে এসে ফিরে চলে যাও! আমি সন্ধান পেয়েছিলুম, আজ তুমি কালী-মন্দিরে আসবে। আমাদের সেই দিনগুলোর কথা একবার মনে কর। দেখ, ঐ কালো টলটলে জল। তারপর আমাদের অনন্ত সম্ভোগ।

আমি তাকে বললুম—সুন্দরী, আমি ত জন্মস্মর নই। গত জন্মের কথা আমার একটুও মনে নাই। তবে ফিরে জন্মে যদি তোমার প্রেম পাই ত আমি এখনি এখানে ডুবে মরতে পারি।

সুন্দরী তার তুষারের মতন ঠাণ্ডা অধর দিয়ে আমার অধর স্পর্শ করে বল্লে—"যাও' আর দেরী করো না।"

আমি ছুটে সেই সাগরের জলে লাফিয়ে পড়তে গেলুম—মনে হল, যেন, সেই কালো মর্ম্মরের মত জল ফুঁড়ে একটা স্কন্ধ বিহীন কদাকার জীব তার লম্বা হাত বাড়িয়ে আমায় লুফে নিতে এল। সম্মুখে তার বীভৎস মূর্ত্তি দেখে আমি পেছিয়ে এলুম। ভৈরবীর কাছে সরে এসে দেখলুম, সে কাঁদছে, তার অশ্রু দেখে আমার মনের ভিতর থেকে মৃত্যুভয়টা চলে গেল, আমি লাফিয়ে সেই সাগরের জলে ঝাঁপ দিলুম।

যখন জ্ঞান হল, তখন সকাল হয়ে গিয়েছে। বুঝতে পারলুম, ক'জন লোক আমার পরিচর্য্যা করছে। একটু সুস্থ হতেই

তারা আমায় ধরে রাণার রাজ্যের সীমার বাইরে ছেড়ে দিয়ে এল, আর বলে দিলে, ফের যদি তারা আমায় তাদের এলাকায় দেখতে পায় ত আমার সাজা হয়ে যাবে।

তার পর অনেক বার লুকিয়ে আমি উদয়সাগরের জলে আত্মহত্যা করবার চেষ্টা করেছি কিন্তু রাণার লোকেরা টের পেয়ে আমায় ধরে ফেলেছে, শেষকালে একদিন তারা আমায় ধরে একেবারে আমাদের দেশে চালান করে দিলে।

আজও কতদিন ঘুমের ঘোরে শুনতে পাই, যেন সম্পা আমাকে সেই মরুভূমির দেশে ডাক্‌ছে, দেখতে পাই, উদয়-সাগরের ধারে বসে সে যেন জলের দিকে হাত বাড়িয়ে দেখাচ্ছে—এইখানে—এইখানে।

নিশিকান্তর কাহিনী শেষ হয়ে যেতে উমানন্দ প্রথমে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে বল্লে—তোমায় নিশ্চয় নিশিতে ডেকেছিল।

গুপীনাথ বল্লে—নিশিতে পাওয়া কি রকম?

—সে এক রকম ভূত আছে। তারা ঘুমের ঘোরে মানুষকে ডেকে নিয়ে গিয়ে জলে ডুবিয়ে মারে।

গুপীনাথের মুখ ততক্ষণে শুকিয়ে একেবারে আম্‌সির মতন হয়ে গিয়েছে—শুক্‌নো গলাটা ঝেড়ে নিয়ে সে আমায় বল্লে—প্রাণে মেরে ফেলে?

ভবানন্দ একটু রসিকতা করে তাকে বল্লে—কি যাদু, ভূত বিশ্বাস হয়?

মল্লারের সুর

তার নাম লক্ষ্মীমণি। সে অন্ধ। রাস্তায় ভিক্ষা করে বেড়ায়।

চিরদিন তার এ অবস্থা ছিলনা। তার রূপ-যৌবন, ধন-দৌলত সবই ছিল। আজ যারা তাকে দেখে ঘৃণায় মুখ-ফিরিয়ে চলে যায়, এমন দিন ছিল যখন সে তার বিলাসিতার প্রাসাদ-শিখরে বসে তাদের প্রতি কৃপা-কটাক্ষ করত। হাসি, গান আর তার সঙ্গে শতশত পুরুষের তোষামোদ উপভোগ করেই তার সকাল থেকে সন্ধ্যে অবধি কেটে যেত। আজ তার কণ্ঠ-স্বর বিকৃত, কিন্তু এই কণ্ঠই বিচিত্র সুরের লীলায় যখন উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠত তখন মনে হ'ত যেন রাগ-রাগিণী মূর্তি ধরে শ্রোতাদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। বুঝি আকাশে-বাতাসে এমন সুর নেই যা তার গলার সুরে ধরা না দিয়েছে। কিন্তু আজ? আজ কোথায় সে সুর? প্রাণের বীণার তার ছিন্নভিন্ন হয়ে কোথায় ছড়িয়ে গেছে,—তাতে আর কোনো সুরই বার হয় না একটা লজ্জাভরা ভিক্ষার কর্কশ ভাঙা সুর ছাড়া।

কেমন করে এমন হল? ঘটনাটি সামান্য, কিন্তু তাই থেকে তার ভাগ্যে এতবড় একটা প্রলয় ঘটে গেল।

সে আজ দশ বৎসরের কথা।

সে দিন আকাশে খুব ঘটা করে বর্ষার উৎসব লেগেছিল। তারই মৃদঙ্গের বোল্, বর্ষণের সুর আর নূপুর-নিক্বণের তাল

পৃথিবীর উপর ছড়িয়ে পড়ে এখানেও একটা ছোটখাট উৎসব জমিয়ে তুলে ছিল।

এই উৎসবের সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্মীমণির মজলিসে একটা জলসা চলছিল। লক্ষ্মী ধরেছিল মল্লারের করুণ সুর। শ্রোতা ছিল যারা তারা যে খুব রসিক সে কথা বলা যায় না—কিন্তু সুরের সেই কান্নার মত কাঁপুনি তাদের নিসাড় হৃদয়ের মধ্যে গিয়ে যে তোলপাড় আরম্ভ করলে তাতে তাদের সমস্ত অন্তরটা কেমন-একটা অজানা ব্যথায় গলে পড়তে লাগল—যেন সেখানেও একটা বর্ষণ সুরু হয়েছে। লক্ষ্মী গাইছিল যে করুণ সুরে তার করুণতা তাকে একেবারে আঁকড়ে ধরেছিল।

যখন এমনি করে আসর জমে উঠেছে—যখন ভিতর-বাহির চারিদিকে কান্নার মত একটা করুণ সুরে ভরে উঠেছে, যখন এই করুণতার সুর লক্ষ্মীমণির সেই ঘরে আর ধরে না তখন হঠাৎ ঘরের দরজা ঠেলে কে প্রবেশ করলে। মনে হ'ল যেন বাইরের ব্যাকুল ঝড় পাগলের মত ছুটে এসে ঘরে ঢুকেছে। যে এল রুক্ষ তার কেশ, রুক্ষ তার বেশ, কে যেন তার শুষ্ক দেহ, মলিন বসনের উপর জল ও কাদার চুমকি বসিয়ে দিয়েছে। হঠাৎ মনে হ'ল এ যেন কোনো আগন্তুক নয়, ঘরে-বাইরে আজ যে করুণ সুরের স্রোত চলেছে তাই থেকেই যেন এই মূর্ত্তি ফুটে উঠেছে—এমনি করুণ তার দৃষ্টি। সবাই অবাক হয়ে তার দিকে চেয়ে রইল।

সে বলে উঠল—"আমার ছেলে? আমার ছেলে কৈ?"

শুনে মনে হ'ল এ যেন কথা নয়, কান্না!

গান থেমে গিয়েছিল, কিন্তু তার করুণ রেশ সমস্ত ঘরের মধ্যে, শ্রোতাদের সমস্ত মনের মধ্যে তখনও ঘুলিয়ে উঠছিল। মনে হ'ল সেই রেশের সঙ্গে বৃদ্ধের গলা যেন একসুরে বাঁধা।
শ্রোতাদের মধ্যে তারই ঝন্‌ঝনা বেজে উঠতে লাগল।

বৃদ্ধ আবার বললে—"আমার ছেলে কোথায় গেল!"

কেউ কোন উত্তর করতে পারলে না—চুপ করে রইল।

লক্ষ্মামণি বললে,—"কে তোমার ছেলে?"

বৃদ্ধ বললে—"বিপিন।"

বলেই সে আর্ত্তনাদ করে উঠল—"সর্ব্বনাশ হয়েছে।"

তার সেই আর্ত্তনাদের সুরে সকলের মনে হল যেন একটা সর্ব্বনাশ সত্যই ঘনিয়ে এসেছে। বাইরে আকাশের বিদ্যুতের কাঁপুনি, মেঘের ঝন্‌ঝনা যেন সজোরে কেঁপে কেঁপে বেজে উঠতে লাগল।

বৃদ্ধ বলতে লাগল—"আজ দুদিন সে বাড়ী যায় নি। কি করেছে সে জান? আফিসের টাকা ভেঙেছে। পুলিশ আজ সমস্ত দিন ধরে আমার বাড়ী খানাতল্লাসী করেছে—তারা বলে আমি তাকে লুকিয়ে রেখেছি। আমার উপর কি অত্যাচার করেছে দেখবে?"—বলে সে চাদরখানা খুলে শরীরে প্রহারের চিহ্ন দেখাতে লাগল। রক্ত তখনো ঝুঁজিয়ে পড়ছে।

সেইদিকে চেয়ে একটা দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে লক্ষ্মীর মুখ থেকে

বেরিয়ে উঠল—“আহা।” অমনি সমস্ত ঘরের মধ্যে একটা অস্ফুট প্রতিধ্বনি উঠল—“আহা!”

লক্ষ্মীমণি বললে—“কি করলে তুমি এ বিপদ থেকে উদ্ধার পাও? তোমার ছেলেকে লুকিয়ে রাখতে হবে? আচ্ছা, আমি রাজি আছি।”

বৃদ্ধ বললে—“না না, তাতে কোনো ফল হবে না। টাকা-গুলো তুমি ফিরিয়ে দাও, আমি আফিসের লোকদের হাতে-পায়ে ধরে যেমন-করে পারি মিটিয়ে নেব।”

লক্ষ্মীমণি আশ্চর্য্য হয়ে বললে—“টাকা! কোন্ টাকা ফিরিয়ে দেব?”

বৃদ্ধ বললে, “যে টাকা সে তোমায় এনে দিয়েছে। সে ত তোমার জন্যেই চুরি করেছে, তার স্ত্রী-পুত্র না খেয়ে মারা গেলেও তার মাথার টনক নড়ে না।”

লক্ষ্মীমণি বললে—“আপনি ভুল করছেন, টাকা সে আমায় দেয়নি।”

বৃদ্ধ বললে—“নিশ্চয়ই দিয়েছে, নইলে সে চুরি করবে কেন? সে ত আগে এমন ছিল না, যেদিন থেকে তোমার কুহকে পড়েছে, সেদিন থেকেই তার মতিগতি বিগড়েছে।”

তার কুহকে পড়ে অনেকের মতিগতি বিগড়েছে লক্ষ্মীমণি সে কথা মনে মনে অস্বীকার করতে পারলে না কিন্তু এ চুরির টাকা তার তহবিলে যে আসেনি এ কথা সম্পূর্ণ সত্য। তাই

সে মাথা-নেড়ে চীৎকার করে বলে উঠল—"না না, আমি বলছি টাকা সে আমায় দেয় নি।"

বৃদ্ধ বললে—"নিশ্চয়ই দিয়েছে। জানি তোমরা অনেক চাতুরী জান। এ বুড়োর সঙ্গে কেন চাতুরী খেলছ? নগদ টাকা না দিয়ে থাকে তোমার গয়না গড়িয়ে দিয়েছে, দাও সে গুলো ফিরিয়ে দাও, তোমার পায়ে পড়ছি দাও।"—বলে বৃদ্ধ তার পা জড়িয়ে ধরলে।

লক্ষ্মী পা ছাড়িয়ে নিয়ে একটু পিছনে সরে গেল। তার নিজের গাওয়া সেই মল্লারের সুর তখনো তার মনের দ্বারে আঘাত দিয়ে দিয়ে ফিরছিল; মনের বাঁধকে আলগা করে দিয়ে তাকে কেমন যেন সব ভুলিয়ে দিচ্ছিল। বৃদ্ধের চোখের জল দেখে তার চোখের পাতা ভিজে এল। সে বলে উঠল—"কত টাকা?"

বৃদ্ধ একটা আশার উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে উঠল—"আট হাজার টাকা।"

আট হাজার! লক্ষ্মীমণির মনে হতে লাগল একটা বুড়ো বামুন একটু চোখের জল ফেলে—এতগুলো টাকা নিয়ে যাবে? সে হবে না। সে বলে উঠল, "না না, অত টাকা হবে না—তুমি যাও।"

ঝড়ের ঝাপটে শুকনো গাছ যেমন ভেঙে পড়ে বুড়ো ঠিক তেমনি করে ভেঙে পড়ল। সেই সময় আসর থেকে একজন উঠে বৃদ্ধকে হাত ধরে হিঁচড়ে টেনে নিয়ে যেতে লাগল। কিন্তু

দরজা অবধি যাবার আগেই লক্ষ্মী বলে উঠল,—"না না, কেন ওকে টানাটানি করছ! দাঁড়াও।" এই বলে দেরাজের টানাটা খুলে একখানা নোট বার করে তার হাতে দিয়ে বললে—"এই নিন।"

বৃদ্ধ হাত পেতে তার কাছ থেকে নোটখানা নিয়ে করুণ দৃষ্টিতে তার মুখের পানে তাকিয়ে বললে—"এতে কি হবে? দাও, দাও, আরো কি আছে দাও, আর দেরি কোরোনা। হতভাগা দুদিন বাড়ী যায়নি, তার বাড়ীতে যে কি কাণ্ড চলছে তা সে একবার ভাবেও না। আজ দুদিন আমরা সবাই এক রকম অনাহারে কাটিয়েছি, তার ছোট ছোট মেয়ে-ছেলেগুলো ক্ষিধের জ্বালায় সকাল থেকে কেঁদে কেঁদে আধমরা হয়ে পড়েছে, এ সব না হয় সহ্য হবে কিন্তু হতভাগার যদি জেল হয় তাহলে যে কচি কচি ছেলে-মেয়েগুলো না খেতে পেয়ে মারা যাবে—ওর স্ত্রীকে যে রাস্তায় দাঁড়াতে হবে।"

রাস্তায় দাঁড়াতে হবে! এই কথা ভাবতে ভাবতে বহুকাল বিস্মৃত একদিন সন্ধ্যেবেলাকার একটি ছবি লক্ষ্মীর চোখের সামনে ফুটে উঠল। আকাশের সমস্ত বিভীষিকা নিয়ে এসে সেদিনকার সন্ধ্যা তার চোখের সামনে উলঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এই হাসি, নাচ, গান-ভরা পৃথিবী সেদিন তার চোখে কী বিষ ছড়িয়ে দিয়েছিল! কী ভয়ঙ্কর অসহায়তা, কী নিদারুণ নিষ্ঠুরতার সঙ্গেই না তাকে লড়াই করতে হয়েছিল!—বিদ্রোহী মন যে পথে যাবার বিরুদ্ধে বেঁকে দাঁড়িয়েছিল সেই মনকে

কী নিষ্ঠুর শাসন করে, কি-রকম ক্ষতবিক্ষত করে তাকে ফেরাতে হয়েছিল!—সে ব্যথা সে আজও ভুলতে পারে-নি। তার গোপন হৃদয়ের পরতে পরতে অদৃশ্য লিপিতে যে কাহিনী লেখা ছিল অতীত আজ বর্ত্তমানের মূর্ত্তি ধরে সেগুলোকে তার মনের সামনে আজ স্পষ্টতর করে ফুটিয়ে তুলতে লাগল—সে কি ভীষণ যন্ত্রণা!

ছুটে গিয়ে লক্ষ্মী আলমারির দরজা খুলে গয়নার বাক্সটা এনে বৃদ্ধের সামনে ফেলে দিয়ে বললে,—"যাও, আর একমিনিটও দেরি কোরেনা, তাহলে হয়ত তোমার পুত্রবধূকে রাস্তায় দাঁড়াতে হতে পারে। যাও, যাও—কী ফ্যালফ্যাল করে মুখের দিকে তাকিয়ে আছ!"

বৃদ্ধ বাক্সটা খুলে অবাক হয়ে একবার গয়না-গুলোর দিকে আর একবার তার মুখের দিকে তাকাতে লাগল।

পাগলের মত চেঁচিয়ে উঠে লক্ষ্মী দুহাত দিয়ে ঠেলে তাকে একেবারে ঘরের বার করে দিলে।

তার মাথা তখনও ঘুরছিল; মনে হতে লাগল গয়নাগুলোর সঙ্গে সঙ্গে তার শরীরের সমস্ত রক্তও যেন নিঃশেষ হয়ে গেছে। বাইরের আকাশের দিকে চেয়ে দেখলে, বর্ষণ তখন থেমে গেছে;—আকাশ যেন তার সমস্ত সম্পদ ঝরিয়ে দিয়ে ঠিক তারই মত নিঃস্ব হয়ে ঝিমিয়ে পড়েছে। লক্ষ্মী রিক্ততার একটা ব্যাকুলতায় আত্মহারা হয়ে ঘরের মধ্যে ছুটোছুটি করতে লাগল। তার অবস্থা দেখে বন্ধুবান্ধবেরা আস্তে আস্তে সরে পড়ল।

তার পর পিছনের বারান্দা থেকে একজন ছোকরার হাত ধরে ঘরের মধ্যে টেনে এনে লক্ষ্মী বললে—"চুরির টাকা কোথায় রেখেছিস বল্। শিগ্‌গির বল্। সে টাকা আমায় এক্ষুনি এনে দে। আমার সর্ব্বস্ব আজ তোর জন্যে বিলিয়ে দিয়েছি, জানিস্!"

বিপিন বললে, "জানি। কিন্তু কেন দিলি?—টাকা আমার নেই।"

লক্ষ্মী বললে,—"কোথায় গেল টাকা?"

"কি হবে তা শুনে? সে টাকা ত আর ফিরে পাবিনি।"

"তবে তুই কাউকে দিয়েছিস্?"

"হ্যাঁ।

"কাকে দিলি? বল্, শিগ্‌গির বল্, কে তোর পেয়ারের লোক আছে!"

"আমি বলবনা। শুন্‌লে তুই রাগ করবি।"

"না না তুই বল্!"

বিপিন জড়িতকণ্ঠে বললে,—"টাকা আমি কামিনীকে দিয়েছি—"

—"কামিনী—কামিনী! চোর কোথাকার, পাজি বদমায়েস বেরো এখান থেকে, বেরো!"

বিপিন লক্ষ্মীর হাত ধরে বললে, "রাগ করিসনে ভাই!"

লক্ষ্মী সজোরে তার হাত ছিটকে ফেলে দিয়ে সরে দাঁড়াল; বললে—"চোরকে আমি ঘরে ঠাঁই দিইনে—বেরো তুই চোর!"

বিপিন উত্তেজিত হয়ে বললে—“চোর চোর করিসনি বলছি !”

লক্ষ্মীমণি একটা অট্টহাস্য করে বলে উঠল—“ওরে আমার সাধুরে ! তুই চোর না ত কি !”

বিপিন আর সামলাতে পারলে না, সামনে থেকে একটা ঘটি তুলে নিয়ে লক্ষ্মীমণির গায়ে সজোরে ছুঁড়ে মারলে। সেই ঘটি তার মুখের উপর এসে লাগল—সে ঘুরে পড়ল—তার দুটো চোখ আর মুখের খানিকটা একেবারে থেঁতালে গেল।

বিপিন তাকে একা ফেলে ছুটে বেরিয়ে গেল।

আঁধিয়া

আমার এই দুঃখের কাহিনী কাউকে শোনাব বলে' যে লিখতে বসেছি তা নয়। আমার মনের কথা মুখ-ফুটে বলতে না পেরে আমার বুক ফেটে যাচ্ছে। দুঃখের কথা নিয়ে নাড়া-চাড়া করলে দুঃখ যে দূর হয়না তা সবাই জানে,-কিন্তু তবু চুপ করে থাকতে পারেনা। আমার কাছে যে কেউ নেই! কাকে বলি? তাই আপনার মনে নিজের কাহিনী লিখতে বসেছি।

মনে পড়ে সেইদিন, যেদিন উৎসবের একটা ঝট্কা বাতাস নিয়ে শ্বশুরবাড়ী প্রবেশ করেছিলুম, শাঁক, ঢাক, শানাইয়ের আওয়াজ আর চেঁচামেচির মধ্যে আমাকে বরণ করে শ্বশুরবাড়ীর লোকেরা আমায় ঘরে তুলে নিলে। আমাকে দেখে আমার শাশুড়ীর পছন্দ হল, তিনি বল্‌লেন, বেশ বৌ হয়েছে—চির-এয়োস্ত্রী হয়ে বেঁচে থাক।

আমার স্বামী আমার বিবাহে একটি পয়সাও নেননি; আর একটি পয়সাও না নেবার মতন লোক এতদিন খুঁজে পাওয়া যায় নি বলেই ষোল বৎসর বয়স পর্য্যন্ত আমাকে থুবড়ো-আইবুড়ী থাকতে হয়েছিল।

আমার নাম সুরবালা; বাবা আমায় সুরো বলে ডাকতেন। আমি তাঁর বড় আদুরে মেয়ে ছিলুম। বাপের বাড়ী বাবার সঙ্গে সঙ্গেই গিয়েছে,—এখন প্রশ্ন হচ্ছে, আমার শ্বশুরবাড়ী বল্‌তে কিছু আছে কি না?

ছেলেবেলাতেই মা মারা গিয়েছিলেন। তাঁর কথা আমার মনে পড়ে না, বাবা একলাই দুজনের স্থান অধিকার করে আমায় মানুষ করছিলেন। তিনি সরকারী চাকরী করিতেন; কখনো এখানে, কখনো সেখানে—এমনি করে, তাঁকে চার-দিকে ঘুরে বেড়াতে হত। আমাকে ছেড়ে তিনি থাকতে পারতেন না। তাঁকে ছেড়েও আমি থাকতে পারতুম না। কাজেই তাঁর সঙ্গে আমাকেও ঘুরতে হত। চাকরী করা ছাড়া তাঁর একমাত্র কাজ ছিল আমায় লেখাপড়া শেখানো আর টাকা জমানো। তিনি বলতেন, স্নুরো, তোর এমন জায়গায় বিয়ে দেবো যে—"

বাবার সদা-সহাস্য মুখের সেই কথাগুলো আজও মাঝে-মাঝে মনে পড়ে আর হাসি আসে।

জীবনের ধারা এইরকম শুভ্র, স্বচ্ছ, তরঙ্গহীন গতিতে বেশ একটানা বয়ে যাচ্ছিল,হঠাৎ একটা ঘটনায় বিপরীত তরঙ্গ ছুটল।

একদিন বাবা আফিস থেকে ফিরে আসবার পর, রোজ যেমন যাই তেমনি হাসিমুখে তাঁর কাছে ছুটে গেলুম। দেখলুম তাঁর মুখ অত্যন্ত বিষণ্ণ, চোখদুটো লাল হয়ে রয়েছে। আমার হাতদুটো তাঁর হাতের মধ্যে নিয়ে তিনি গুমরে কেঁদে উঠে বললেন,—"স্নুরো আমাদের সর্ব্বনাশ হয়েছে মা—

জিজ্ঞাসা করে জানলুম যে-ব্যাঙ্কে আমাদের টাকা থাকত সেটা ফেল হয়ে গিয়েছে। তাঁর অনেক কষ্টে জমানো টাকা-গুলোর একটা পয়সাও ফিরে পাবার আশা নেই।

তাঁর চোখের জল জীবনে সেই একদিন মাত্র দেখেছি। এর আগে তাঁকে কখন সামান্য বিষণ্ণ হতেও দেখিনি। আমি চিরদিন হাস্‌তেই দেখেছি,—খালি হাসি আর হাসি। এই হাসির আবহাওয়াতেই আমি মানুষ হয়ে উঠেছিলুম, চন্দ্রসূর্য্য, রাত্রিদিন, আকাশ-পৃথিবী চিরকালই আমাকে সহাস্য মূর্ত্তিতেই দেখা দিয়ে এসেছে, দুঃখের সঙ্গে, কান্নার সঙ্গে আমার একেবারেই পরিচয় ছিল না। সেদিন বাবার চোখে জল দেখে আমার মনে কি ভাব এসেছিল এত দিন পরে ঠিক করে গুছিয়ে বলতে পারব না, তবে এই ছবিটা এখনো মনে আছে যে আমি যেন দেখতে লাগলুম তাঁর চোখের জলে আমার সেই হাসির রাজ্যটা ভাসতে ভাসতে দূরে মিলিয়ে গেল ;—উপরের নীল আকাশ এমন গাঢ় হয়ে এল যে সে অন্ধকার ভেদ করে কাউকে চিনতে পারবার যো রইলনা, আর সেই অনন্ত অশ্রু-পারাবারের মধ্যে আমি একা—

ওঃ, মানুষের চোখে এত জলও থাকতে পারে!

সমস্ত রাত্রি ভাবনায় কেটে গেল, সে কত-রকমের ভাবনা! একটা থেকে আর একটা, আবার সেটা শেষ হবার আগেই আর-একটা, এমনি করে যেন একটা চিন্তার পৃথিবী আমার মাথার ভিতর পাক খেয়ে-খেয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগল। আপন-হারা হয়ে বসেছিলুম, ভোরের ঠাণ্ডা বাতাস গায়ে লাগতেই চমকে উঠলুম! মনে হল, সামনে থেকে কে যেন সরে গেল।

তখন বুঝতে পারিনি, সে কে? আজ মনে হয় সর্ব্বনাশে দুত এসে আমার শিয়রে দাঁড়িয়েছিল, শুধু বাবার জন্যে সে সাহস করে ঢুকতে পারেনি।

তখনো একেবারে ফর্সা হয় নি, মুমূর্ষু রাত্রির প্রাণটা তখনো আলো-ছায়ার একটা সূক্ষ্ম রেখার উপর দোল খাচ্ছে, অবশ পা-দুটোকে কোনরকমে সোজা করে সে দুটোর উপর ভর দিয়ে দাঁড়ালুম, দেখি, সামনে বাবা দাঁড়িয়ে।

তিনি বললেন—সারা রাত্রি জেগে এখানে বসে আছিস মা?

আমি আর কোন কথা বলতে না পেরে তাঁর বুকে মুখ রেখে কাঁদতে লাগলুম।

তিনিও আমায় জড়িয়ে ধরলেন; একটা কথা কানে গেল—"টাকাগুলো গেল বুঝি! তোর উপায় কিছু করে যেতে পারলুম না।"

কিছুক্ষণ পরে একটা আশীর্ব্বাদী চুমু আমার মাথার উপর দিয়ে তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

পরদিন বাবা অফিসে গেলেন, বুঝতে পারিনি এই যাওয়াই তাঁর শেষ যাওয়া। বিকেলবেলায় অফিসের লোকেরা তাঁকে কোলে করে বাড়ী নিয়ে এল, শুনলুম, তাঁর মূর্চ্ছা হয়েছে। ডাক্তার ডাকা হল। তিনি বললেন এ মূর্চ্ছা ভাঙবে না, আত্মীয়স্বজন যদি কেউ থাকে ত এইবেলা খবর দিন, বোধ হয় চব্বিশ ঘণ্টার বেশী বাঁচবেন না।

সর্ব্বনাশ এত কাছে কাছে ঘুরে বেড়ায় অথচ মানুষ তার গন্ধও পায় না!

*　*　*　*　*　*

মামার বাড়ীতে আমায় বেশী কষ্টভোগ করতে হয়নি। প্রথমটা একটু কষ্ট মনে হত। তার কারণ কষ্ট কাকে বলে এর আগে একেবারেই জানা ছিল না, আজকের হিসেবের খাতায় সে দিনগুলোর সুখ-দুঃখের জমা-খরচ খতিয়ে দেখলে দেখতে পাই তখন সুখের মাত্রাই বেশী ছিল।

মামা আমার আপনার মামা নন্, মার মাসতুত ভাই। বাবার মৃত্যুর আগে তাঁকে আমি বার-কয়েক দেখেছিলুম মাত্র। তাঁর সঙ্গে বাবার পত্র-ব্যবহার চলত। তিনি আমায় নিয়ে এলেন।

তিনি বেশ দিলখোলসা লোক ছিলেন। সামান্য চাকরী করতেন, যা মাইনে পেতেন তাতে কোনরকমে সংসার চলে। তার উপর আমার মত একটা ধাড়ী মেয়েকে এ-রকম ভাবে আশ্রয় দিয়ে ঘরে নিয়ে আসাতে মামী আমাকে সুনজরে দেখতে পারলেন না। কিন্তু ক্রমে সেটাও আমার সহ্য হয়ে গিয়েছিল।

মামার বাড়ী আসার মাস কয়েক পরে প্রায় বছর দুই ধরে আমার জন্যে তাঁদের বড় অশান্তিতে কাটাতে হয়েছিল। সেটা হচ্ছে আমার বিবাহ নিয়ে। টাকা না পেলে কেউ বিয়ে করতে চায় না! মামা মনে করেছিলেন, সুন্দরী মেয়ে

টাকা না হলেও চলবে, কিন্তু সুন্দরী মেয়ের চেয়েও অনেক বেশী সুন্দর অর্থের জোগাড় করতে না পারলে যে পাত্রের অভিভাবকের মন টলে না, এই অভিজ্ঞতাটা তাঁর আমার উপর দিয়েই হয়ে গিয়েছিল।

মামীর তাড়না আর গঞ্জনা সহ্য করতে করতে তিনি অস্থির হয়ে পড়তে লাগলেন। কিন্তু এত অশান্তির মধ্যেও তাঁকে একটা কটু কথা বলতে শুনিনি। ধন্য তাঁর ধৈর্য্য! পরের মেয়ের জন্য এতটা সহ্য করতে পারে, এ-রকম লোকও দুর্লভ নয়।

তারপর সেইদিন সত্যি সত্যিই এল। শুনলুম, আমাকে দেখে একজন পছন্দ করেছেন। তিনি এক পয়সাও চান না, তাঁর অবস্থা ভাল, হাতে শুধু দুগাছা রুলি পরিয়ে নিয়ে যাবেন।

যখন এই খবর পেলুম, শুনলুম তিনি এক পয়সাও নেবেন না, শুদ্ধ আমাকেই চান, তাঁর দামটা আমার এই নিঃস্ব মামা বেচারাকে দিতে হবে না, কৃতজ্ঞতায় প্রাণটা তখন কানায় কানায় ভরে উঠল। মনে মনে তাঁকে নতি জানিয়ে বললুম—কে তুমি শুকতারার মত আমার দুঃখের রাত্রিতে এসে দেখা দিলে? তোমায় চিনিনা আমি, কিন্তু তোমার মহৎ হৃদয়ের পরিচয় আমি পেয়েছি। হে দেবতা, আমায় নিয়ে যাও তুমি তোমার মন্দিরে, বড় দুঃখী আমি, ভালবাসার কাঙাল আমি—আমায় ভালবাসো।

আনন্দের আবেগে আত্মহারা হয়ে পড়লুম। সমস্ত রাত্রি অনিদ্রা, তন্দ্রা, নিদ্রার মধ্য দিয়ে কেমন করে কেটে গেল বুঝতে পারলুম না। সকালে উঠে মনে মনে তাঁকে প্রণাম করে সংসারের কাজে লেগে গেলুম।

স্বামীকে দেখলুম। তিনি পরম রূপবান না হলেও সুশ্রী বটে। ফুলশয্যার দিন তাঁর সঙ্গে প্রথম কথা হল। বিবাহের পর স্বামীর সঙ্গে কথা, সে—যাক্ সেদিনকার কথা আর তুলব না।

শ্বশুরবাড়ী যখন এলুম, তখন প্রকৃতির বীণায় বসন্ত-রাগিণীর পুরোদমে মহড়া চলেচে! গাছে গাছে, ফুলে ফুলে, পাখীর ডাকে বাইরে যেমন একটা আনন্দের হিল্লোল বয়ে যাচ্ছিল, বাড়ীখানাও তেমনি নাচ-গান, খাওয়া-দাওয়ার গোলে বেশ সরগরম হয়ে উঠেছিল।

ঘর আর বাহির দুইয়ে মিলে আমায় অভিষেক করে সেবারকার বসন্তের রাণী বলে ঘরে তুলে নিলে।

শ্বশুরবাড়ীতে আমার পদার্পণের পর বাড়ীর চেহারা ফিরে গেল। আমার শাশুড়ী অল্পবয়সে বিধবা হয়েছিলেন; শুনলুম বিধবা হওয়ার পর তাঁর মুখে কেউ হাসি দেখেনি, আমি বাড়ী আসার পর তাঁকে সবাই হাসতে দেখলে।

আমার স্বামী সদা-প্রফুল্ল লোক। আনন্দের আস্বাদন আমি জীবনে এই যে প্রথম পেলুম তা নয়, কিন্তু এ যেন নতুন রকম! সামান্য সামান্য ঘটনা আমার প্রাণের মধ্যে একটা

আনন্দের ঝড় তুলে দিয়ে যেত। বাতাস লাগলে আমার পা-থেকে মাথার প্রত্যেক চুলের গোড়াগুলো অবধি শিউরে উঠত। ফুলে এত রংয়ের বাহার, এতদিন ত লক্ষ্য করিনি! দীঘির জল এমন টলটলে জীবনে এর আগে ত তা দেখিনি! সন্ধ্যায় দিগন্তের ধার ঘেঁসে দিনের তরী সোনালি পাল উড়িয়ে অস্ত-অচলের উদ্দেশে চলে যেত, শুক্ল চতুর্দ্দশীর নিটোল গোল চাঁদখানা আমাদের কালো আয়নার মত দীঘিটার বুকের উপর পড়ে নির্জ্জনে নীরব প্রেমালাপ আরম্ভ করত, আমি আত্মহারা হয়ে দেখতুম, আর মনে হত ঠিক এমনধারা ত এর আগে কখনও দেখিনি!

আনন্দের প্রবাহ আমার মধ্যেই যে শুধু প্রবাহিত হচ্ছিল, তা নয়, দেখলুম আমাকে ছাড়িয়ে সেটা গ্রামময় তার রঙিন নিশেন উড়িয়ে দিয়েছে।

বিকেলবেলায় আমি গা ধুয়ে ছাদের উপর অনেকক্ষণ বেড়াতুম। একদিন দেখি সামনের বাড়ীর একটা ছেলে আমাকে দেখচে। একটু লক্ষ্য করে বুঝলুম আমি যেন তাকে না দেখতে পাই এমনিভাবে একটা জানলার আড়ালে সে দাঁড়িয়েছে। সেই ম্যালেরিয়া-জীর্ণ চেহারাটা দেখে আমার মায়া হতে লাগল। সে কতদিন যে স্নান করেনি তার ঠিকানা নেই; হাঁ করে তন্ময় হয়ে আমাকে দেখছিল। দুই একদিন বাদে দেখলুম ছেলেটা স্নান করতে সুরু করেছে। আবার কিছুদিন পরে সেও আমার মত ছাদে বেড়াতে আরম্ভ করে দিলে।

তার সেই শূয়ার-কুচি চুলে বেশ করে তেল দিয়ে টেরি বাগানো আর গুণ-গুণ করে গান গেয়ে ছাদে বেড়ানো দেখে আমার হাসি পেত।

বাড়ীর পিছনদিকে আর-এক জনেরা থাকত। সে-বাড়ীরও একটা ছেলে হঠাৎ সঙ্গীত শিক্ষা আরম্ভ করলে। বাপ্ রে বাপ, সে স্বর-সাধনা মনে পড়লে আজও আমার হৃৎকম্প উপস্থিত হয়! দিনরাত্রি জানলার ধারে বসে হারমোনিয়ামে গলা ভাঁজা। নিশ্চয়ই বলতে পারি, যদি তার সাধনা সেই রকম ভাবে চলে থাকে তবে এত দিনে নিশ্চয় সে একজন গুরুগম্ভীর ওস্তাদ হয়ে উঠেছে।

রাস্তার ধারে একটা জানলা ছিল, আমি মধ্যে মধ্যে সেখানে গিয়ে দাঁড়াতুম। কিছুদিন যেতে না যেতে দেখি পাড়ার লোকগুলো জানলা-মুখী ব্রত নিলে। এমন তাদের তন্ময়তা যে একদিন সত্যিই একটা লোক গাড়ী চাপা পড়ে প্রাণটা হারাবার যো করেছিল। কিন্তু তবুও বিরাম নেই। উঃ, কী গভীর সাধনা!

কেউ কেউ বেশী সাহসী হয়ে মাঝে মাঝে জানলার ধারে এসে শিষও দিত। প্রথম প্রথম এদের ব্যাপার দেখে আমার বেশ মজা লাগত, কিন্তু ক্রমেই সেটা অসহ্য হয়ে উঠল। একদিকে সেই কদাকার চেহারাটার দিনরাত উঁকি-ঝুঁকি, পিছনদিকে সুর-সাধনার সেই বিকট চীৎকার, আর সামনে রাস্তার ধারে জানলার কাছে লোকের ভিড় দেখে আমি অস্থির হয়ে উঠলুম।

ক্রমেই তারা বেশী সাহসী হয়ে উঠতে লাগল। আমার ইচ্ছে হত বাইরে গিয়ে সব কটাকে ধরে আচ্ছা করে কান মলে দিয়ে আসি। কিন্তু আমার ত বাইরে যাবার উপায় নেই, আমি যে কুলবধূ!

ঘরের চারিদিকের জানলাগুলো আমি দিনকয়েক বন্ধ করে রেখে দিলুম। একদিন আমার স্বামী বললেন, জানলাগুলো বন্ধ রেখে কি দম আটকে মারবে!

জানলা বন্ধ করার কারণ শুনে তিনি হো হো করে হেসে উঠলেন। তাঁর সেই হাসিতে আমি থতমত খেয়ে কিছু বলতে পারলুম না। তিনি নিজের হাতে জানলাগুলো খুলে দিয়ে, আমায় একটা জানলার ধারে বসিয়ে গল্প করতে লাগলেন।

আমাদের কয়েক ঘর সরিক ছিল, কিন্তু বিনোদ ছাড়া আর-কারো সঙ্গে আমার স্বামীর তেমন বনিবনাও ছিল না। সে সম্পর্কে তাঁর ভাই। বয়স দুজনের প্রায় সমান। বিনোদ যখন-তখন আমাদের বাড়ী আসত। বৌভাতের দিন থেকেই সে আমার সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠতা দেখাতে লাগল। আমি তার সামনে প্রথমে ঘোমটা খুলতুম না। সে একদিন আমার স্বামীকে বল্লে—"দাদা, বৌদি যদি অমন করে মুখ ঢেকে থাকেন, তাহলে আমি তোমার ঘরে আর আসছি না।" স্বামী একটু অপ্রস্তুত হয়ে আমাকে ঘোমটা খুলতে বললেন। আমি তাঁর ইচ্ছায় ঘোমটা খুললুম, কিন্তু বিনোদের চোখের দৃষ্টি আমার ভাল লাগল না। ইচ্ছে হচ্ছিল আবার ঘোমটাটা টেনে দিই কিন্তু

তাহলে স্বামীর মান থাকে না, তাই ঘোমটা খুলেই রইলুম। বিনোদকে দেখে আমার মনে হতে লাগল, স্বামীর পাশে সে যেন একটা কীটাণুকীট!

কিন্তু কি আশ্চর্য্য, যাকে সংসারে অতি তুচ্ছ বলে জানলুম, সেই আমার সব চেয়ে বড় শত্রু হল।

স্বামীর আজ্ঞাতেই বিনোদের সঙ্গে আমি কথা বলতেও সুরু করলুম। কথা আমি কইতুম না, কিন্তু দেখলুম তা না হলে স্বামীর আঁতে ঘা লাগে। আমাদের বাড়ীর কেউ বিনোদকে ভাল চোখে দেখত না, সবাই সন্দেহ করত যে আমার স্বামীটিকে কোন্‌দিন বা সে অধঃপাতে টেনে নিয়ে যায়। সেইজন্য সবাই তাকে ভয় করত, ঘৃণাও করত। আমাদের বাড়ীতে তার এই অনাদরের জন্য স্বামীর মনে ভারি একটা ক্ষোভ ছিল। আমিও যদি তাঁর বিনোদকে অবহেলা করতে সুরু করি তবে সেটা তাঁর বুকে খুবই বাজবে, আমি বুঝলুম। আমি একদিন তাঁকে জিজ্ঞাসা করলুম—"বিনোদের উপর তোমার এত দরদ কেন? ও কি তোমার যোগ্য?" স্বামী বললেন—"দেখ সুরো, ও লক্ষ্মীছাড়া আমি জানি। কিন্তু ও যে আমার আশ্রয় নিয়েছে। ও বলে, ওর স্বভাবের জন্যে সবাই ওঁকে ত্যাগ করেছে, এখন আমিও যদি ত্যাগ করি তাহলে ও অধঃপাতের অতলে একেবারে তলিয়ে যাবে। ওর বিশ্বাস, আমাকে অবলম্বন করেই ও উঠে দাঁড়াবে।"

আমার স্বামীর এই দয়া দেখে আমার সমস্ত হৃদয় পুলকিত

হয়ে উঠল। আমার মনে হল আমার এমন স্বামী—তাঁর কাজে আমি প্রতিবন্ধক হব?

বিনোদের সঙ্গে আমার এতটা ঘনিষ্ঠতা আমার শাশুড়ীর চোখে ভাল ঠেকেনি। তিনি মধ্যে-মধ্যে রাগ করে বকতে লাগলেন। শাশুড়ীকে অমান্য করবার ইচ্ছা আমার ছিল না, কিন্তু স্বামীর প্রাণে ব্যথা দিতেও আমার প্রাণ কেঁদে উঠত। বিনোদকে নিয়ে আমি মুস্কিলে পড়লুম।

এ ছাড়া আরও মুস্কিল ছিল এই যে বিনোদের হাবভাব আমার মোটেই ভাল লাগত না। তাকে দেখলে মনের মধ্যে অত্যন্ত একটা ঘিন্‌ঘিনে ভাব আমাকে পীড়া দিত। ঠাট্টার সম্পর্ক বলে সে সময়-সময় যে রকম ঠাট্টা করত তাতে তার মুখ-দর্শন করা উচিত ছিল না, এবং তার এমন একটা গায়ে-পড়া স্বভাব ছিল যার জন্য তার কাছ থেকে চলে যাবার জন্যে মন বিদ্রোহী হয়ে উঠত। ভাবতুম স্বামীকে সব খুলে বলি। মনে-মনে কথাটা নিয়ে তোলাপাড়া করতুম, তারপর সাজিয়ে-গুজিয়ে কথাটা যা দাঁড় করাতুম তা মনের মধ্যে আবৃত্তি করে এমন জঘন্য শোনাত যে স্বামীর সামনে তা বলতে পারতুম না। তিনি কি এ-সব বুঝতেন না? কে জানে? হয়ত পুরুষমানুষ বলে' আমাদের এই নারীবৃত্তিগুলো অনুভব করবার শক্তি তাঁর ছিল না। আমি তাঁকে একদিন বললুম—"দেখ, বিনোদ একটু বাড়াবাড়ি করচে না?" স্বামী আমার কথাটা বুঝলেন কি না জানিনা, তিনি সহজভাবে বললেন—"দেখ সুরো, বিনোদ

বাড়াবাড়ি করে' করবে কি ? তুমি যদি খাঁটি হও তাহলে দুনিয়ায় ভয় কাকে ? তোমায় আমি বিশ্বাস করি। কাজেই বিনোদ কেন, বিনোদের চেয়ে সহস্রগুণে ভয়ঙ্কর রাক্ষসকে আমি ডরাই না।"

স্বামীর এই কথায় আমার মনের সমস্ত কুয়াশাটা যেন এক মুহূর্ত্তে কেটে গেল। নিজের মধ্যে একটা শক্তিময় চেতনা অনুভব করতে লাগলুম। সত্যিই ত, আমি যদি খাঁটি হই ত ভয় কাকে! তারপর, আমার উপর স্বামীর প্রগাঢ় বিশ্বাস! আত্ম-অভিমানে আমার সমস্ত হৃদয় ফুলে উঠল। আমি মনে মনে প্রার্থনা করলুম—হে ভগবান, স্বামীর এই বিশ্বাস যেন চিরদিন অটুট রেখে মরতে পারি, আমাকে এই বর দাও।

আমার স্বামী তখন বাড়ী ছিলেন না, জমিদারীর কাজে তাঁকে বিদেশে যেতে হয়েছিল। তাঁকে বছরের মধ্যে বার দুই এমনি করে বাইরে যেতে হত। হাতে কোন কাজ নেই, তিনি বাড়ী নেই, তাই ঘরে যাবারও তাড়া নেই। রাত্রে খাওয়া-দাওয়া সেরে শুতে যাবার আগে ছাদের উপর একটু বেড়াতে গেলুম।

সেদিন চাঁদ তার ফিরোজা রঙের ঘোমটাখানা দূরে ফেলে দিয়ে মনের আনন্দে তার সমস্ত কিরণ-কণা পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিচ্ছিল। পৃথিবী তারই পেলবস্পর্শ আরামে অবশ হয়ে উপভোগ করছিল। বাগানে বড় বড় গাছ আর কামিনীফুলের ঝাড়গুলো পাতায় পাতায় রূপালী দেয়ালী সাজিয়ে দাঁড়িয়ে

আছে আর সেইগুলোর পাশে পাশে রোগা, মোটা নানান আকারের এক-একটা অন্ধকার দৈত্য উপুড় হয়ে বসে আছে—এক-একটা রাজ্যহীন রাজার মত।

চারিদিকে নিরবচ্ছিন্ন শান্তি, কোথাও একটু আওয়াজ নেই, আমি তন্ময় হয়ে চাঁদ আর পৃথিবীর মাঝখানে দাঁড়িয়ে তাদের এই খেলা উপভোগ্য করতে লাগলুম।

হঠাৎ একটা পাগলা হাওয়া কোথা থেকে দৌড়ে এসে এই আধ-ঘুমন্ত পৃথিবীর মাথাটা ধরে বেশ জোরে একটা নাড়া দিয়ে তাকে সজাগ করে তুলে পালিয়ে গেল। বড় বড় গাছগুলো মাথা নাড়া দিয়ে তাদের মর্‌মর্‌ ভাষায় একবার একটা আর্ত্তনাদ করে উঠল। মনে হল তাদের পাতার রূপোর প্রদীপগুলো মাটির উপর গিয়ে পড়ল, ঝোপ-ঝাড়ের পাশে পাশে যে বিকট-আকার দৈত্যগুলো এতক্ষণ ওৎ পেতে বসেছিল কার ইঙ্গিতে সেগুলো তাড়াতাড়ি উঠে একবার এদিক ওদিক ছুটোছুটি করে আবার একজায়গায় স্থির হয়ে গিয়ে বসে পড়ল। রাত্রির সে নিস্তব্ধ ভাবটা আর ফিরে এল না। হঠাৎ এই রকমভাবে তার শান্তিভঙ্গ হওয়াতে সে আর স্থির হতে পারলে না। আমি এতক্ষণ আনন্দে যে দৃশ্য দেখছিলুম তার পট পরিবর্ত্তন হওয়াতে আমারও মনটা খারাপ হয়ে গেল, নীচে নেমে এলুম।

শোঁবার ঘরের দরজায় খিল লাগিয়ে বিছানার কাছে গিয়ে দেখি খাটের উপর মনুষ্যমূর্ত্তি! ঘরের মধ্যে মিট্‌মিট্‌ করে প্রদীপ জ্বলছিল। আমি ভয়ে এমন কাঠ হয়ে গেলুম যেন মাটির

সঙ্গে আমার পা দুটো একেবারে গেঁথে গেল। আমার শোবার ঘরে স্বামীর লোহার সিন্দুক থাকত, তাতে জমিদারী থেকে টাকা এসে জমা হত। তিনি এবার জমিদারী থেকে যত টাকা পাঠাচ্ছিলেন আমি গুণেগেঁথে তার মধ্যে বন্ধ করে রেখে দিয়েছিলুম। তিনি ফিরে এলে হিসেব বুঝিয়ে দিতে হবে। আমার সবপ্রথম নজর পড়ল সেই লোহার সিন্দুকের দিকে। দেখলুম, সেটার গায়ে এখনো হাত পড়েনি। এখনো সময় আছে ভেবে আমি দরজার কাছে এগিয়ে গিয়ে চোর-চোর বলে চেঁচিয়ে উঠলুম। লোকটা ছুটে এসে দরজা চেপে দাঁড়াল। তার মুখ দেখতে পেলুম—সে বিনোদ!

আমি অবাক হয়ে গেলুম। তাকে বললুম, "তোমার দাদা ত এখানে নেই—তুমি এত রাত্রে কেন?" বিনোদ হাসতে হাসতে বললে—"তোমার কাছে এসেছি।" আমি রেগে বললুম—"যাও, এখান থেকে বেরিয়ে যাও।" সে এমন একটা কথা বললে যাতে আমার সর্ব্বশরীর জ্বলে উঠল। আমি একটু এগিয়ে এসে বললুম—"পথ ছাড়, আমি বেরিয়ে যাই।"

বিনোদ দরজার গায়ে সজোরে পিঠ দিয়ে দাঁড়াল। আমার ইচ্ছে হচ্চিল তাকে পদাঘাতে ঠেলে দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যাই। কিন্তু সেই অন্ধকারে তার চোখদুটো হিংস্র পশুর চোখের মত এমন ভয়ঙ্কর জ্বলছিল যে তার কাছে যেতে ভয় করতে লাগল। আমি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলুম। তাকে যতই দেখতে লাগলুম ততই একটা আতঙ্ক আমার সর্ব্বশরীর ছড়িয়ে

পড়তে লাগল। বাঘের সামনে পড়লে মানুষের কেমন ভয় হয় জানি না, কিন্তু আমার মনে হচ্ছিল এ ভয় যেন সেইরকমের। প্রাণ সংশয় হলে আত্মরক্ষার জন্য মানুষের মন যেমনধারা হোক একটা অস্ত্রের জন্যে যেমন লোলুপ হয়ে ওঠে, আমিও অন্তর থেকে তেমনি একটা তাড়নায় অস্থির হয়ে উঠলুম। দেয়ালে স্বামীর অনেকগুলো ছোরা-ছুরি টাঙানো ছিল। হঠাৎ সেদিকে চোখ পড়াতে আমি একখানা বড় ছোরা টেনে নিলুম।

ছোরা খানা হাতে পেয়ে মনে হল, একা বিপদের মধ্যে, যেন হঠাৎ আত্মীয় বন্ধুর দেখা পেলুম—মনটা একটু আশ্বস্ত হল।

আমি এবার খুব জোরের সঙ্গে বললুম—"যাও ঘর থেকে বেরিয়ে।"

বিনোদ হাসতে হাসতে বললে—"এরি মধ্যে যাব কি?"

আমি রেগে ছোরাখানা হাতে করে দাঁড়ালুম। তবু তার ভয় হল না, সে বললে—"জীবনে অমন ছোরা-হাতে মেয়েমানুষ ঢের দেখেছি।"

আমার ইচ্ছে হল এখনি ওর গায়ে ছোরাটা বসিয়ে দিই। কিন্তু হাত উঠল না। সে বোধ হয় আমার দুর্ব্বলতা বুঝতে পারলে। ধীরে ধীরে সে হাত দুখানা বাড়িয়ে আমার দিকে এগিয়ে এল। তার সেই বিশ্রী ভঙ্গী দেখে আমার সমস্ত শরীরের মধ্যে যে কেমনধারা একটা ঝড় উঠল বলতে পারি না। আমার মনে হল এই ঝড়ে বুঝি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে একটা প্রলয় হয়ে গেল।

তারপর আমি কি করলুম, কি না-করলুম কিছুই মনে নাই। কেবল মনে আছে যেন একটা প্রকাণ্ড ঘূর্ণির মধ্যে আমার হাত-পা মাথা চোখ সব ঘুরছে।...

সকালে যখন জ্ঞান হল, তখন দেখি, বিনোদের দেহের রক্তের উপর আমি পড়ে আছি।

* * * *

হাজতে আমার সঙ্গে কেউ দেখা করতে এল না। মনে করেছিলুম, আমার স্বামী বোধ হয় ঠিক সময়ে ফিরতে পারেন নি, কিন্তু পরে জানলুম, তিনি এসেও আমার জামিনের জন্য চেষ্টা করেন নি।

বিচারে আমি বেকসুর খালাস পেলুম।

তখন শীত পড়েছে, বেলা ছোট। আদালত ভাঙ্‌বার পরেই সন্ধ্যে ঘনিয়ে এল। আমি ধীরে ধীরে বাড়ীর দিকে অগ্রসর হতে লাগলুম, সদর দরজা দিয়ে ঢুকতে কি জানি কেন, সাহস হল না, বাগানে খিড়কী দিয়ে বাড়ীর ভিতর ঢুকে পড়লুম। তখন অন্ধকার বেশ জমাট হয়ে এসেছে, আমাদের ঘরের সামনে বারান্দায় একটা ছোট কেরাসিনের আলো জ্বলছিল। ঝীর নাম ধরে ডাকলুম, কারো সাড়া পেলুম না। বাড়ীটা যেন খাঁ খাঁ করচে। আরও দুই-তিনবার ডাকাডাকির পর ঝী ঘর থেকে বেরিয়ে এল, শুনলুম বাড়ীতে কেউ নাই, আমার শাশুড়ী তাঁর বাপের বাড়ী চলে গেছেন। স্বামীও নিরুদ্দেশ। আমি জিজ্ঞাসা করলুম—"কেন?"

সে বল্লে—"লোকনিন্দের ভয়ে। তুমি যে কাণ্ড করেচ তাতে কি আর দাদাবাবুর মুখ দেখাবার যো আছে! চারিদিকে একেবারে ছি ছি!

আমি ঝীর কথা কানে তুললুম না। আমার অনেক কথা বলবার ছিল, কিন্তু সে ঝী, তাকে কি বলব? তার টিট্‌কারি আমি গ্রাহ্য করলুম না। কারণ আমার মন এত ঝড়-ঝঞ্ঝার মধ্যেও একটি আশার প্রদীপকে তখনো জ্বালিয়ে রেখেছিল। "আমি যদি খাঁটি থাকি তবে ভয় কিসের!"—স্বামীর সেই মন্ত্র, শুধু তখন কেন,—এ-জীবনেই যে ভুলতে পারিনি। ভগবানের কাছে যে-বর চেয়েছিলুম তা ত তিনি পূর্ণ করেছেন—স্বামীর বিশ্বাসের উপর ত এতটুকু আঁচ লাগতে দিইনি! তবে আমার ভয় কিসের?

আমি জোর করে বললুম—"আমার ঘরের দরজা খুলে দে!"

দাসী বললে—"ঘরের চাবি ত আমার কাছে নেই।"

আমি বললুম—"তবে আমি থাকি কোথায়?"

দাসী বেশ একটু রুক্ষ স্বরে বল্‌লে—"থাকতে যদি চাও তবে বাগানের মধ্যে আমার এই খোড়ো ঘরটাতে থাক।"

আমি তখনকার মত সেই ঘরটাতে গিয়ে ঢুকলুম। কিন্তু আমার স্বামী গেলেন কোথা? দিনের পর দিন যায় তাঁর দেখা পাই না কেন? তাঁকে না দেখতে পেয়ে আমার প্রাণ যে আকুল হয়ে উঠল। বাগানে বসে-বসে ঐ শূন্য বাড়ীখানার দিকে চেয়ে কত কথাই ভাবতুম। ঐ ঘর শূন্য করলে কে?

কতবার এ প্রশ্ন মনে উঠেছে। কিন্তু এর কোনো জবাব খুঁজে পাই নি।

এই বিজন-বাসে কারো দেখা পেতুম না, কেউ আমার কাছে আসত না, তার জন্যে আমার কোন দুঃখ ছিল না। কিন্তু স্বামীর দেখা পাচ্ছি না এ যে অসহ্য বেদনা! আমি কেবল তাঁরই প্রতীক্ষা করতুম। কেবলি মনে হত—কেন তিনি আসচেন না?—কেন আসচেন না!

তারপর শীতের শেষ-দিনগুলো বসন্তের গায়ে ঢলে পড়ল। প্রকৃতির মহলে মহলে একটা প্রকাণ্ড উৎসবের আয়োজন পড়ে গেল। চারিদিকেই আনন্দ, কেবল দখিনের বাতাস আমাদের বন্ধ বাড়ীখানার কাছে এসে গুমরে উঠত।

এমনি একটা দিনে দেখলুম আমার ঘরের জানালা খোলা হয়েছে। আমি আর চুপ-করে বসে থাকতে পারলুম না। বাড়ীর ভিতরে যাবার খিড়কীর কাছে ছুটে গেলুম। আশ্চর্য্য, সেখানে ত দরজা নেই। ভুল হয়েছে ভেবে মনের আবেগে পাঁচিলটা আঁচড়াতে লাগলুম। কিন্তু কোথাও দরজা পেলুম না। আমার অলক্ষ্যে সেখানে কবে যে পাঁচিল গাঁথা হয়ে গিয়েছে আমি কিছুই জানিনা! আমি ঝীকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলুম—"ওখানে পাঁচিল গাঁথা হল কেন?"

সে বললে—"জানি না।"

আমি বললুম—"শীগ্‌গির যা, খবর নিয়ে আয়। আমি বাড়ী ঢুকবো কেমন করে?"

ঝী চলে গেল। আমি বসে কত কথাই ভাবতে লাগলুম। মনে হল এতদিনে আমার বিরহের অবসান হল। আজ স্বামীর পায়ে একটি প্রণাম দিয়ে তাঁর ধূলো নিয়ে কয়েদখানার সংস্পর্শে আমার এই অশুচি দেহকে পবিত্র করে নেব। এই সব ভাবছি এমন সময় ঝী স্বামীর হাতের ছোট্ট একখানি চিঠি নিয়ে এসে দিলে। আমি তাড়াতাড়ি সেখানা হাতে তুলে নিলুম। তাতে এইটুকু লেখা ছিল—

—"আমি তোমায় ত্যাগ করি-নি, কিন্তু সমাজ নরহত্যার পাতকীকে গ্রহণ করতে নারাজ। কি করব!"

কি করব!—এই সামান্য একটা কথা যেন বজ্রাঘাতের মত আমার মাথায় এসে পড়ল। আমি একেবারে আড়ষ্ট হয়ে গেলুম।

স্বামী কেবলমাত্র বলেছেন—কি করব! তাঁর কি আর কিছুই বলবার নেই? আমাকে বলবার তাঁর সব কথা হঠাৎ এমনি-করেই ফুরিয়ে গেল? ওগো আমার দেবতা, তুমি যে মন্ত্র আমায় দিয়েছিলে তার অপমান তো আমি করিনি, তবে তুমি কেন বলেছ, কি করব? তুমি কি না করতে পার? তুমি ত আমার মত অবলা নও—তবে কেন অমন হতাশ হয়ে বল্লে, কি করব? ওগো আমার হৃদয়ের দেবতা, তুমি যা করবে, সে তো তোমারই হাতে। কিন্তু আমি যে তোমা ছাড়া জানিনা—তুমি বলে দাও আমি কি করব? আমার মন যে নিরুপায় হয়ে কেবল এই কান্নাই কাঁদচে—ওগো আমি কি করি?—কি করি?

পথের বঁধু

নিতাইয়ের নেশাটা সেদিন কি রকম চড়ে গিয়েছিল, কিছুতেই ঘুম আসছিল না। অনেকক্ষণ ধরে এপাশ-ওপাশ করতে-করতে যেমন একটু তন্দ্রা এসেছে ঠিক সেই সময় দেয়ালের ঘড়িটাতে ঢং ঢং করে দুটো বাজল। নিতাইয়ের মনে হল কে যেন তার মগজে দু-ঘা হাতুড়ী মেরে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। পড়ে পড়ে সে ভাবতে লাগল ঘুম যদি একেবারে না হয়, তবে কালকে আবার আফিসে গিয়ে ঢুলতে হবে। হঠাৎ তার মনে পড়ে গেল—আরে কালকে ছুটি যে। পরম আলস্যে সে পাশ বালিসটাকে জড়িয়ে নিয়ে পাশ ফিরে আবার ঘুমের সাধনাতে মন দিলে।

বেলা তখন প্রায় ন-টা। মুখের উপর রোদ এসে পড়াতে তার ঘুম ভেঙ্গে গেল। রাত্রিতে নেশার ঝোঁকে বালিশ নিয়ে সে মেঝেতেই শুয়ে পড়েছিল। সেইখানে শুয়ে শুয়ে সে দেখলে খাটের উপর চারু পড়ে রয়েছে। তার একটা পা বিছানায় লম্বা হয়ে পড়ে, আর একটা পা মাটির দিকে ঝুলে।—শোয়া ও বসার মাঝামাঝি একটা অবস্থা।

ঘরের এককোনে দুটো দেশী মদের বোতল, একটা খালি, আর একটাতে তখনো একটু মদ রয়েছে। চারুর দিকে চেয়ে

চেয়ে নিতাই বল্লে—ছোঁড়ার এখনও নেশা কাটেনি দেখছি, এই চেরো উঠবিনে—

চারুর কোন জবাব নেই।

নিতাই পাশ ফিরে আবার চোখ বুঁজিয়ে ফেল্লে। আরও আধঘণ্টা এপাশ-ওপাশ করে সে ভূমিশয্যা ছেড়ে উঠে পড়ল। গত রাত্রির ফুর্ত্তির নিশানা তখনো ঘরময় এদিক-ওদিক ছড়ান রয়েছে। সে জিনিষপত্রগুলোকে গুছিয়ে রেখে ঘরটাকে বেশ করে ঝাঁট দিলে। তারপর কাঁঠালকাঠের টেবিলটার উপর থেকে একখানা আধপোড়া সিগারেট তুলে নিয়ে সেটাকে ধরিয়ে ডাকলে—এই চেরো উঠবিনে—

চারু চোখ না চেয়ে শুধু তার দিকে একখানা হাত বাড়িয়ে দিলে—হাতের তর্জ্জনী ও মধ্যমার মধ্যে বিরাট একটা ব্যবধান।

নিতাই একটা সুখ-টান দিয়ে চুরুটটা চারুর হাতে দিলে। চারু চোখ বুঁজিয়েই তাতে কষে একটা টান মেরে উঠে বল্লে—আজ ছুটি না— নিতাই টেবিল চাপড়ে গান ধরলে—

ছুটি ছুটি ছুটি
আজকে ছুটি কালকে ছুটি
পরশু ছুটিরে—
আমরা দুটি চালাই খাঁটি
মজা লুটি রে—

মকদুমপুরে রেলি ব্রাদার্সের যে তিষির আড়ত আছে,

নিতাই ও চারু সেখানে কাজ করে। চারুর দুনিয়ায় কেউ নেই, দূর সম্পর্কের এক মামার বাড়ীতে সে মানুষ হ'চ্ছিল। এই দূর সম্পর্কের মামাকে যেদিন সুদূরের ডাকে তল্পা-তাল্পা গুটোতে হল সেই দিন থেকে তাকে নিজে চরে খেতে শিখতে হয়েছে। নিতাইয়েরও তাই, পৃথিবীতে থাকবার মধ্যে তার এক ঠাকুরমা আছে, কাশীতে থাকে। ঠাকুরমা থাকার জন্য সাংসারিক সুবিধা তার কিছুই নেই বরং অসুবিধাই আছে। কারণ প্রতিমাসে কুড়িটাকা মাইনে থেকে পাঁচটী করে টাকা কাশীতে পাঠাতে হ'ত। দুজনে প্রায় সাত বছর এই মকদুমপুরে এক সঙ্গে বাস করছে, দুইটী সমান অভাগা, মিলেছেও ভাল।

চারু বল্লে, আজ রাঁধাবাড়ার কি হবে? ট্যাকে ত একটী আধলাও নেই।

—কাল কি সব খরচ করে ফেলেছিস্ নাকি!

—ছিলত মোটে তিনটে টাকা—আফিস খোলা থাকলেও না হয় পাওয়া যেত, গুডফ্রাইডের ছুটি পড়ে সব মাটি হয়ে গেল। নিতাই বল্লে—তবুত ছুটির একটা দিনও কাটোন—দে আজ ভাতে-ভাত চড়িয়ে।

—আরে ভাতে-ভাত চড়াই কি দিয়ে, চালও যে নেই, ওদিকে মাংসওয়ালা ব্যাটা এমন তাগাদ জুড়েছে যে ও-পথ মাড়াবার যো নেই।

রাস্তা দিয়ে একটা ছেলে জংলা সুরে কি একটা গান গাইতে গাইতে চলে যাচ্ছিল, নিতাই সেই সুরে শিষ দিতে

আরম্ভ করলে আর চারু তালে তালে টেবিল চাপড়ে তবলা বাজাইতে লাগিল।

মিনিট দুয়েক এই অপূর্ব্ব ঐক্যতানবাদন চলবার পর শিষ থামিলে নিতাই বল্লে—আয় তবে এবেলা একাদশী করা যাক, ওবেলা কানইয়ালালের ওখানে আমার নেমন্তন্ন আছে আসবার সময় গোটা কয়েক লাড্ডু পকেট ভরে নিয়ে আসব'খন।

খানিক পরে আপনার মনে সে আবার বলতে লাগল—ফরসা জামাও নেই, কি পরে যে যাই। আফিসের কোট্ এঁটে ত আর ভদ্রলোকের বাড়ী যাওয়া যায় না।

দুই বন্ধুতে সেদিনকার মতন একাদশীর বন্দোবস্ত করে বেলা এগারোটার সময় আবার বিছানা নিলে। দিনটা প্রায় কাটিয়ে দিয়েছিল হঠাৎ দরজা ধাকার আওয়াজ শুনে চারু তাড়াতাড়ি দরজা খুলে দিয়ে দেখলে একজন আগন্তুক এসে উপস্থিত। লোকটী বাঙ্গালী, বয়স প্রায় তেত্রিশ চৌত্রিশ। চেহারা ও সাজগোজ দেখে ভদ্রলোক বলেই মনে হয়। আগন্তুক চারুকে নমস্কার করে বল্লে—মশায় আমি বাঙ্গালী, নাম নরেশ চন্দ্র ঘোষ। আপনারা বাঙ্গালী তাই আপনাদের এখানে এসে হাজির হয়েছি।

নিতায়ের চোখ থেকে দিবা নিদ্রার জড়তা তখনো কাটেনি। রাত্রে তার ভাল করে ঘুম হয় নি, দিনের ঘুমটী বেশ জমে এসেছিল কোথেকে এই লোকটা এসে লাখ টাকার ঘুমটা মাটি করে দিলে। চোখ বুঁজিয়ে পাশ ফিরতে-ফিরতে

সে বল্লে—তা বেশ করেছেন, কিন্তু এই পাণ্ডব বর্জ্জিত স্থানে আসার উদ্দেশ্য ? প্রত্নতত্ত্ব বুঝি !

নরেশ বল্লে—আর সে কথা বলবেন না মশয়, যাচ্ছিলুম বাঁকিপুরে, এই ষ্টেশনে নেমে খাবার কিনতে-কিনতে ট্রেনখানা ছেড়ে দিলে। আপনারা একঘর বাঙালী আছেন শুনে এখানে এসেছি।

চারু বল্লে—তা বেশ করেছেন।

নিতাই একটা তান ধরলে—

আসিতে হে যদি নব-যৌবনে
ওগো রাজ-অধিরাজ—

—বাঃ দিব্যি গলাটী ত আপনার—

চারু বল্লে—হ্যাঁ, উনি একজন উঁচুদরের গাইয়ে—নাম নিতাই মুখুয্যে। রেলির আড়তের তিষির প্রেমে মজে এখানে আশ্রম কোরেছেন।

নিতাই তড়াক করে বিছানা ছেড়ে লাফিয়ে উঠে হাত নেড়ে বলতে আরম্ভ করলে—আর ইনি এঁর নাম চারু দত্ত,—জাতিতে কায়স্থ বলেন বটে, কিন্তু সেটা বিশ্বাস হয় না—ইনি একাধারে কবি, গল্প লেখক, সমালোচক—বাংলার সাহিত্যগগনের একটী উজ্জ্বল নক্ষত্র—মশায়, ইনিও তিষি—

নরেশ বল্লে—আপনি চারু বাবু—আপনার লেখা ত প্রায়ই পড়ি। আপনার সঙ্গে আলাপ হয়ে বড় আনন্দ হল। বেশ আছেন আপনারা দুটীতে—

নরেশের মুখের কথাটা কেড়ে নিয়ে নিতাই আবার তান ছাড়লে—

আমরা দুটী
স্বর্গ লুটি
মর্ত্ত ভরেছি—

নরেশ নিতাইয়ের দিকে অবাক হয়ে চেয়ে চেয়ে ভাবতে লাগল—আহা, বেশ আছে এরা—না আছে বড়বাবুর রক্তচক্ষু, না আছে সাহেবের দাবড়ী। দুনিয়াশুদ্ধ লোক গুডফ্রাইডেতে চারিদিন ছুটি পায়, নরেশের বড়বাবু তাকে হুকুম করেছিলেন সোমবারে একবার বেরুতে হবে হে—কত কষ্টে বড় বাবুর হাতে-পায়ে ধরে চারিদিনের ছুটি নিয়ে সে একটু বেরিয়ে পড়েছে। কেরাণী জীবনেও এত আনন্দ থাকতে পারে দেখে তার মনটা আপনিই খুসী হয়ে উঠছিল।

তান থামিয়ে নিতাই জিজ্ঞাসা কল্লে—এতক্ষণ ত আমরা নিজেদের বাহাবা গাইলুম, এখন মশায়ের নামটী জিজ্ঞাসা করতে পারি কি?

—খুব পারেন, আমার নাম নরেশচন্দ্র ঘোষ। কলিকাতায় চাকরী করি—

—চাকরী করেন! তবে ও নামটাতে আমার আপত্তি আছে, নামটা বদলে ফেলুন মশায়।

চারু নিতাইকে একটা ধমক দিলে—চুপ কর্! তারপর সে নরেশকে বল্লে—কিছু মনে করবেন না মশায়, ও একটু—

নরেশ একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বল্লে—না, না, মনে করব কেন, উনি ঠিক কথাই বলেছেন।

নিতাই খাটখানার উপর একটা চাপড় মেরে বল্লে—আচ্ছা বাবা, নরেশ নরেশই সই, নামে কি করে—

What's in a name
Oh Romeo—

বাঁকীপুরে কি কাজে যাওয়া হচ্ছিল?

—বাঁকীপুরে কাল সাহিত্য-সম্মিলন হচ্ছে দেখতে যাচ্ছি পথে এই কাণ্ড।

চারু বল্লে—জামা খুলে হাত-পা ধুয়ে ঠাণ্ডা হয়ে বসুন, রাত বারটার গাড়ীতে যাবেন'খন। নরেশ জামা খুলতে লাগল, সেই অবসরে চারু নিতাইকে ইঙ্গিত করলে ভদ্রলোক এসেছে, এখন দক্ষিণ হস্তের ব্যাপারের কি হবে?

নিতাই নির্ব্বিকার ভাবে কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে বলতে লাগল—যীশু বলিলেন হে মনুষ্যপুত্র, তোমরা শুক্রবারে নিরম্বু উপবাসে কাটাইবে, কারণ ঐ দিন আমি তোমাদের স্বর্গরাজ্যে যাইবার জন্য পাশ বিলি করিব।

চারু নরেশকে জিজ্ঞাসা করিলে—আপনার খাওয়া দাওয়া হয়েছে?

নরেশ বল্লে এই ষ্টেশনে পুরী কিনেছিলুম কিন্তু সেই মান্ধাতার আমলের পুরোন পুরীতে প্রবেশ করতে সাহস হল না মশায়, ফেলে দিতে হল।

নিতাই বল্লে—চলুন তাহলে আমাদের সঙ্গে বাজারে। আপনার বেড়ানও হবে, আমরাও খাবার-দাবার কিনে এনে চড়িয়ে দিই। আপনি দয়া করে এসেছেন, অতিথি-সৎকার করতে হবে ত।

এই দুটী লোকের কথাবার্ত্তা আর ব্যবহার দেখে শুনে নরেশ বেচারী একটু ভড়কে গিয়েছিল। ছেলেবেলা থেকে কলকাতায় মানুষ হয়ে তার একটা ধারণা ছিল যে তারা অন্য জায়গার লোকদের চেয়ে একটু উচ্চ শ্রেণীর জীব। নিতাই আর চারু তার সঙ্গে ঠাট্টা করছে, না, তাহাদের ব্যবহারই ঐ রকম তাই নিয়ে সে একটু গোলমালে পড়ে গেল। যাক, যতক্ষণ এখানে থাকা যায় চুপ করে বসে না থেকে দেশটা একটু ঘুরে দেখে নিলে মন্দ কি—ভেবে নরেশ বল্লে—চলুন।

পায়চারি করতে করতে তারা বেনের দোকানের সামনে এসে দাঁড়াল। কয়েক দিন থেকে এই লোকটার তাগাদার চোটে তারা এই রাস্তা দিয়ে চলা ফেরা বন্ধ করে দিয়েছিল। দোকানে এসে চারু মস্ত একখানা ফর্দ্দ দিয়ে বল্লে—এখুনি এই জিনিস গুলো যেন বাসায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়, দামটা দিনকয়েক পরে পাবে।

বাবুদের সঙ্গে নূতন লোক দেখে বেনিয়া মহারাজ পুরোন ধারের কথাটা আর পাড়েনি কিন্তু আবার ধারের কথা শুনে সে খাপ্পা হয়ে বল্লে—আগাড়ী যো উধার গিয়া—

—দাঁড়া না ব্যাটা, ভগা নেহি ভেজনেসে কাঁহাসে রূপেয়া দেগা ?

বেনিয়ার নন্দন অবাক হয়ে খানিক্ষণ চারুর দিকে চেয়ে থেকে নিতাইকে জিজ্ঞাসা করলে—ভগা ! !

নিতাই বল্লে—হাঁ—ভগাকা নাম নেহি শুন—এত্‌না বড়া ম্যাজিষ্ট্রেট—উ চারু বাবুকা দাদা হায়।

মাংসওয়ালাকেও ভগার চেক দেখিয়ে তারা সন্ধ্যের সময় বাজার করে নিয়ে বাড়ী ফিরে রান্না চড়িয়ে দিলে।

নরেশ গায়ের কোট আর পাঞ্জাবীটা খুলে এক জায়গায় টাঙ্গিয়ে রেখে তাদের সঙ্গে রাঁধতে লেগে গেল। ঘণ্টা খানেক পরে নিতাই চারুকে ডেকে বল্লে—ওরে আমি কানাইয়ালালের বাড়ী থেকে ঘুরে আসছি, বেচারা অনেক করে বলে গেছে—গোটা চারেক গান গেয়েই পালিয়ে আসব।

—আচ্ছা, বলে আবার চারু ময়দা মাখার দিকে মন দিলে।

নরেশ চারুকে সাহায্য করছিল আর ভাবছিল এখানে এসে বেচারীদের বড় ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছি, ভাবটা একটু জমিয়ে নেবার জন্য সে চারুকে জিজ্ঞাসা করলে—চারু বাবুর দেশ কোথায় ?

চারু একচোখ বুজিয়ে কাঠের উনুনে ফুঁ দিতে দিতে বল্লে—আকাশের তলায়—আপনার ?

—আমার বর্দ্ধমান জেলায়, তবে দেশের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই।

ফুঁ দিতে দিতে উনুনটা যখন বেশ ধরে উঠল তখন চারু মাংসর হাঁড়িটা চাপিয়ে দিয়ে গত রাত্রে যে বোতলটা শেষ করা হয়নি সেটাকে বের করে গেলাসে একটু ঢেলে নরেশকে বল্লে—আসুন।

নরেশ হাত জোড় করে বল্লে—মাপ কর্ব্বেন মশায়, ওসব অভ্যাস নেই।

—বিলক্ষণ, কলিকাতায় থাকেন আর অভ্যেস নেই কি রকম, সে কি একটা কথা হল।

শনিবার হলেই নরেশদের মেসের বাবুরা মদ খেয়ে হল্লা লাগাত। সোজা মানুষগুলো জলের মতন এই একটু পদার্থ খেয়ে কি রকম ওলট-পালট হয়ে যায় দেখে দেখে ও জিনিষটার উপর তার একটা ভয় দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। তবে জীবনে কখনো মদ ছোঁয়নি একথা সে হলফ করে বলতে পারে না। মেসের বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে তাকে দু' একবার খেতে হয়েছিল কিন্তু নেশা হবার মতন মদ সে কখনো খায় নি। কাজেই মদ খেতে যে কষ্টটুকু পেতে হয় তার অভিজ্ঞতা নরেশের ছিল, নেশার মজাটা সে কখনো পায় নি।

সে হাত জোড় করে বল্লে—আমায় মাপ করুন চারু বাবু—আবার বারোটার গাড়ীতে যেতে হবে।

চারু বল্লে—আপনি না খেলে বুঝব গরীব বলে এই

ধান্যেশ্বরীকে অবহেলা কচ্ছেন। আমায় এখন তবে বিলাতী আনতে যেতে হল।

সে আলনা থেকে জামাটা নিয়ে তাতে হাত গলাতে লাগল।

চারুকে জামা পরতে দেখে নরেশ বল্লে—আহা—না—আপনি পাগল হলেন নাকি—আচ্ছা দিন মশায়—আপনার কথায় এটুকু খাচ্ছি, আর খেতে বলবেন না কিন্তু—

সে চারুর হাত থেকে গেলাসটা নিয়ে চোঁ করে এক চুমুকে পাত্রটা নিঃশেষ করে ফেল্লে।

সমস্ত দিন রেলের ঝাঁকুনি খেয়ে খেয়ে নরেশের শরীরে একটা অবসাদ এসেছিল। সুরার অব্যর্থ শক্তিতে তার সে অবসাদটুকু কেটে গিয়ে মনটা একটু প্রফুল্ল হয়ে উঠল। নরেশের মনে হচ্ছিল, একটা গান গাওয়া যাক্—কিন্তু চারু কি মনে করবে ভেবে এই অহেতুকী ফুর্ত্তিটাকে কোন রকমে চেপে সে জিজ্ঞাসা করলে—নিতাই বাবুর গলাটী বেশ, না?

মাংস কষতে কষতে চারু জবাব দিলে—বেড়ে—

নরেশের মনে হচ্ছিল আর একটু খেলে হত। কিন্তু প্রথমে সে যে রকম আপত্তি করেছিল তাতে আর চাওয়া যায় না—সে ঠিক করে রাখলে এবারে বল্লে দেওয়া-মাত্র খেয়ে ফেলব। আধঘণ্টা পেরিয়ে যাবার পরও চারুর কোন রকম উচ্চবাচ্য না পেয়ে নরেশ মুখ ফুটে বলে ফেল্লে—দাদা, খুব কম করে আমায় আর একটু দিন ত।

চারু নরেশকে একটুখানি দিয়ে বোতলে যেটুকু ছিল নিজে শেষ করে রান্নায় মন দিয়েছিল, নরেশ আবার চাওয়াতে সে একটু ফাঁপরে পড়ে গেল। বোতলে ত এক ফোঁটা নেই, তা ছাড়া কাছে পয়সাও নেই যে আনিয়ে নেবে! তবু সে বল্লে—আর ত নেই দাদা, আচ্ছা দাঁড়াও, আনিয়ে নেওয়া যাচ্ছে—

নরেশ কোটের পকেট থেকে ব্যাগটা বার করে বল্লে—চল দাদা, তা হলে বেরিয়ে পড়া যাক্, ওটা এনে তারপর রান্নার দিকে মন দেওয়া যাবে।

চারু একবার মুখ তুলে দেখলে, নরেশ যেখানে কোট আর পাঞ্জাবী খুলে রেখেছিল সেখানে শুধু কোটটা ঝুলছে। পাঞ্জাবীটা অন্তর্হিত হয়েছে দেখে সে আপনার মনে বিজ বিজ করে কি বল্লে।

নরেশ বল্লে—দাদা আমাকে কিছু বলছ?

—না ভাই, ভাবছি, কাকে দিয়ে বোতলটা আনাই।

নরেশ ব্যাগটা খুলে জিজ্ঞাসা করলে—ক'টাকা লাগবে দাদা?

—ও কি, তুমি টাকা বার করছ কেন?

—ওই ত দাদা, আমাকে পর ভাবলে।

চারু পাড়ার একটা ছেলেকে ডেকে টাকাটা দিয়ে তখুনি তাকে ষ্টেশনে পাঠিয়ে দিলে।

ঘণ্টা দেড়েক বাদে দেখতে পাওয়া গেল চারু মাটিতে পড়ে

প্রাণপণে পাশ বালিসটাকে জড়িয়ে ধরে চুমু খাচ্ছে আর বলছে—

—ছিলে খেলার সঙ্গিনী
এখন হয়েছ মোর মর্ম্মের গৃহিণী।

আর নরেশ তার সামনে উবু হয়ে মাথায় হাত দিয়ে বসে রয়েছে, তার গাল বয়ে টস টস করে চোখের জল গড়িয়ে পড়ছে।

হঠাৎ একটা দমকা বাতাস এসে মোমবাতিটাকে নিবিয়ে দিয়ে গেল। ঐটুকু আলোর মধ্যে একরাশ জ্যোৎস্না কি রকমে লুকিয়ে ছিল, বাতিটা নিবে যেতেই ঘরটা চাঁদের আলোয় ভাসতে লাগল।

জ্যোৎস্না দেখে চারু পাশ বালিসটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সুরু করলে—

হে সুন্দরী, হে প্রেয়সী, হে পূর্ণ পূর্ণিমা,
অন্তরের অন্তরশায়িনী! নাহি সীমা
তব রহস্যের!

ওদিকে কানাইয়ালালের আসরে বসে মাংস পোড়ার গন্ধে নিতাই চমকে চমকে উঠতে লাগল।

নরেশ তন্ময় হয়ে চারুকে দেখছিল, হঠাৎ সে বলে উঠল—মাংসটা বোধ হয় পুড়ে গেল।

এঁ্যা—বলে চারু একলাফে উঠে পড়ে দেশলাই খুঁজে বাতিটা

জ্বেলে মাংসর হাড়ি নাবিয়ে ফেল্লে। তারপর নিজে একপাত্র খেয়ে নরেশকে একটা পাত্র ভরে দিলে।

নরেশকে পাত্রটা দিয়ে সে হাঁড়ি থেকে একটা মাংসের টুক্‌রো তুলে নিয়ে দেখছিল, সেগুলো খাবার অবস্থা পেরিয়ে গেছে কিনা। এমন সময় নরেশ বল্লে—দাদা পাঞ্জাবীটা ওখানে রেখেছিলুম দেখতে পাচ্ছিনা।—

—এঁ্যা, পাঞ্জাবী! তাইত গেল কোথায়। চারু বাইরের বারান্দায় গিয়ে ডাকলে—ভত্তু—নেতা ছোঁড়া সেই যে গেছে—তাইত মহা মুস্কিলে পড়লুম যে!

চারু ঘরে ঢুকতেই নরেশ বল্লে—খোঁজ পেলে দাদা? সেটাতে সোণার বোতাম ছিল।

—কিছু ভয় নেই, এই পাত্রটা টেনে নাও, ও পাঞ্জাবী কিছু মনে থাকবে না। নরেশ সে পাত্রটা নিঃশেষ করে গেলাসটা রাখতে রাখতে বল্লে—রেখে দাও তোমার পাঞ্জাবী—পড় দাদা, কবিতা পড়।

আধ ঘণ্টার মধ্যেই তারা তুমি ছেড়ে তুই-তুকারি আরম্ভ করে দিলে। খানিকক্ষণ পরে চারু প্রতিজ্ঞা করে বল্লে—তোর অফিসের বড়বাবুকে আমি খুন করে ফেলব। ঘণ্টা খানেক পরে তারা দুজনে দিব্যি করে ফেল্লে—জীবনে আর কখনো ছাড়া-ছাড়ি হব না।

রাত্রি বারোটার সময় নিতাই টলতে টলতে দুম-দাম করে ঘরের মধ্যে এসে দেখলে একদিকে একতাল ময়দা মাটিতে

গড়াচ্ছে আর একদিকে নরেশ আর চারু গলা জড়াজড়ি করে মেঝের উপর পড়ে রয়েছে।

তাদের সেই অবস্থা দেখে নিতাই কীর্ত্তন ধরলে—

আমার নাগর, যায় পর-ঘর
আমারই আঙিনা দিয়া—

বারোটার গাড়ী তখন ষ্টেশনে এসে ভোঁ দিচ্ছিল, বাঁশীর শব্দ পেয়ে নরেশ ধড়মড় করে উঠে বল্লে—বারোটার গাড়ী কি চলে গেল দাদা ?

নিতাই বাতিটা ফুঁ দিয়ে নিবিয়ে ধড়াস্ করে খাটের উপর পড়ে স্থুর ভাঁজতে লাগল।

—যাচ্ছে যাক, কিছু বোলো না, কিছু বোলো না।

হাত-ফের

নিবারণ বাড়ীর বড় ছেলে হলেও সংসারের সব-চেয়ে বড় বোঝাটা মাথায় তুলে নেবার মত শক্তি তার কাঁধে তখনো হয়নি। তার বাবা তিন-চারিটি ছোট ছোট ছেলে-মেয়ে নিয়ে সংসার-সমুদ্রে কোনরকমে টাল খেতে-খেতে একটা অজানা আঘাটায় তাদের নামিয়ে রেখে যখন সরে পড়েছিলেন, তখন সে নিতান্ত শিশু।

তার মা গ্রামের লোকদের বাড়ি কাজকর্ম্ম করে কোনো রকমে তাদের ছোট সংসারটি চালিয়ে নিত; কিন্তু সে-রকম করে বেশীদিন আর চলল না; কয়েক বছর যেতে-না-যেতেই দেশে দুর্ভিক্ষ এল; কিছু দিন বাদে, যারা তাদের সাহায্য করত তাদেরই দিন-চলা ভার হয়ে উঠল।

নিবারণ তখন গ্রামের এন্‌ট্রেন্‌স্‌ স্কুলের তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ে। তার মা তাকে অনেক কষ্টে লেখা-পড়া শেখাচ্ছিল, কিন্তু শেষে এমন হল যে দিন আর চলে না। ছোট ভাই-বোনদের ক্ষিধের কান্না আর মায়ের বুকফাটা চোখের জল দেখে-দেখে নিবারণের দিন-কাটানো অসহ্য হয়ে উঠল।

সে শুনেছিল সহরে গিয়ে চেষ্টা করলে নাকি অর্থ উপায়ের সুবিধা হতে পারে। লেখাপড়া শিখে ভবিষ্যতে বড়-লোক হয়ে সংসারের দুঃখ ঘোচাবার একটা দুরাশা অনেকদিন তাকে

প্রলুব্ধ করে রেখেছিল, কিন্তু শেষটা তাকে বাধ্য হয়ে তার মায়া কাটাতে হল।

একদিন সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে মার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সে কলকাতায় চলে এল। রইল তার পড়া-শুনো, রইল তার ভবিষ্যতের সেই রঙিন ছবিগুলো—কল্পনার তুলি দিয়ে যে-গুলোর উপরে এতদিন ধরে সে হাত বুলিয়ে এসেছিল।

বর্ষার একটা সন্ধ্যায় সে সহরে এসে নাম্‌ল। এখানে কারো সঙ্গে তার পরিচয় নেই। সে এখন যায় কোথায়? একটা রেলের কুলি তাকে যাত্রীদের বিশ্রামের ঘরখানা দেখিয়ে দিলে; সেইখানেই রাত্রিটা কাটিয়ে দেবার জন্যে হাজার-যাত্রীর মধ্যিখানে একটু জায়গা করে নিয়ে সে শুয়ে পড়ল।

রাত্রিটা একরকমে জেগেই কেটে গেল। এত আলো সে জন্মে-কখনো দেখে-নি; আর এত গোলমালও এর আগে কখনো শোনে-নি। এই হট্টগোলের ভিতরেও মানুষ এমন স্বচ্ছন্দে ঘুমুতে পারে দেখে সেদিন সে ভারি আশ্চর্য্য হয়ে গিয়েছিল।

সকালবেলা ষ্টেশন ছেড়ে সে সহরের ভিতর ঢুকল। ঘোড়ার গাড়ী, ট্রামগাড়ী, মটরগাড়ীর মাঝখানে পড়ে নিজেকে বাঁচিয়ে চলতে বেচারী পদে-পদে আপনাকে বিপন্ন করে তুলতে লাগল।

অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত সহরের চারিদিক ঘুরে প্রায় সন্ধ্যার সময়

একটা দোকান থেকে দু-পয়সার মুড়ি কিনে খেয়ে গঙ্গার ধারে গিয়ে সে বসল।

গঙ্গার ধারটা সহরের অন্য জায়গার চেয়ে অনেকটা নিস্তব্ধ। ঘাটের একটা ধাপের উপর চুপ করে বসে-বসে সে ভাবতে লাগল—মা, ভাই, বোন। সুদূর সেই পল্লীগ্রাম থেকে তাদের কান্না যেন বাতাসে ভেসে এসে তার কানে পৌঁছতে লাগল।

তার চোখে জল আসছিল। কি করবে সে একা এই সহরে? অসহায় অপরিচিত সে কি করে অর্থ-উপায় করে বাড়ীতে পাঠাবে? তার কেমন ভয়-ভয় করতে লাগল। একবার ভাবলে যাই বাড়ী ফিরে, যেমন করে হোক দিন সেখানে কেটে যাবে; না-হয় সকলে একসঙ্গে গলাগলি হয়ে মরে থাকব! ট্যাকে তার যে ক'টা পয়সা ছিল একবার বার করে গুণে দেখে আবার সেগুলো ট্যাকে গুঁজে রাখলে। তারপর আবার মনে হ'ল বাড়ীর সবাই অনাহারে দিন কাটাছে, আমার আশাতেই পথ চেয়ে বসে আছে। এই সব ভাবতে ভাবতে তার কান্নার বেগ ক্রমেই বেড়ে গেল,—মুখে কাপড় দিয়ে সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

—"কিরে ছোঁড়া, এখানে বসে কি কচ্ছিস?"

নিবারণ চমকে উঠল। সহরে এসে অবধি কারো সঙ্গে তার কথা হয়-নি। হঠাৎ এই সম্ভাষণে সে একেবারে ভড়কে গেল।

সে পাশ ফিরে দেখলে, একটা লোক—যেমন লম্বা তেমনি চওড়া। অন্ধকারে তার মুখখানা ভাল দেখা যাচ্ছিল না, কিন্তু তার চোখদুটে জ্বল্‌জ্বল্‌ করে জ্বল্‌ছিল। সেই চেহারা দেখে নিবারণের মুখ দিয়ে কোনো কথা বেরুল না। তার কান্না থেমে গিয়েছিল কিন্তু তখনো তার গলা দিয়ে থেকে-থেকে কান্নার একটা হেঁচ্‌কি উঠছিল। সে কি উত্তর দেবে কিছু ভেবে ঠিক করবার আগেই লোকটা বলে উঠল—"ইস্‌, আবার কান্না হচ্ছে ? আহ্‌রে গোপাল আমার রে ! কাঁদছিস্‌ কেন ? ক্ষিদে পেয়েছে বুঝি ?"

অজ্ঞাতসারে তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল—"হ্যাঁ।"

ক্ষিদে তার পেয়েছিল সত্যি। সমস্ত দিন অনাহারের পর দু-পয়সার মুড়ি খেয়ে পাড়াগেঁয়ে ছেলের পেট ভরেনা, কিন্তু সে লোকটাকে ক্ষিদের কথা জানাবার তার মোটেই ইচ্ছা ছিল না।

লোকটা নিবারণের হাতখানা ধরে টেনে দাঁড় করিয়ে দিয়ে বল্‌লে—"ক্ষিদে পেয়েছ ত এখানে বসে কি কচ্ছিস্‌? চল্‌।"

মন্ত্রচালিতের মত নিবারণ তার সঙ্গে-সঙ্গে চলতে লাগল।

কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে লোকটা বেশ মুরুব্বিয়ানা চালে তাকে বল্‌লে—"ক্ষিদেই যদি পেয়ে থাকে তবে গঙ্গার ধারে মরতে গিয়েছিলি কেন ? ওখানে যাবি খেয়ে-দেয়ে হাত-মুখ ধুস্তে, বুঝলি ছোঁড়া !"

নিবারণ ভয়ে-ভয়ে একটা ছোট্ট "হ্যাঁ" বলে তার সঙ্গে সঙ্গে সুড়্ সুড়্ করে চলতে লাগল।

তারপর এ-গলি সে-গলি—এম্‌নি করে প্রায় আধঘণ্টা ঘুরে তারা একটা হোটেলে গিয়ে ঢুকল।

হোটেল-ওলাকে খাবার দিতে বলে লোকটা পকেট থেকে একটা মদের বোতল বার করে গেলাসে ঢেলে মাঝে মাঝে তাতে চুমুক মার্‌তে লাগল।

খাবার যা এল তার আকার আস্বাদন সবই নিবারণের কাছে একেবারে নতুন। ক্ষিদের ঝোঁকে দু-এক কামড় খাবার পর তার আর খেতে প্রবৃত্তি হল না। মদ আর মাংসের একটা বিকট মিশ্র-গন্ধে তার পেটের ভিতর থেকে বমি ঠেলে উঠতে লাগল। সে-লোকটা মদের গ্লাসটা নিবারণের দিকে এগিয়ে দিয়ে জড়ান-জড়ান সুরে বল্লে—"একটু খাবি ?"

নিবারণ ঘাড় নেড়ে জানালে—"না।"

একটু পরে সে জিজ্ঞাসা করলে—"তোর নাম কিরে ?"

সে ভয়ে ভয়ে বল্লে—"নিবারণ।"

এক গাল হেসে লোকটা বলে উঠল—"বা-রে, বেড়ে নাম ত—নি-বা-র-ণ !"

একটু চুপ করে থেকে খানিকটা আধসিদ্ধ মাংস চিবোতে চিবোতে সে আবার বল্লে—আমার নাম কেষ্ট, বুঝলি ?" আবার খানিক চুপ করে থেকে জিজ্ঞাসা করলে—"এখানে কি করিস্ ?"

নিবারণ উত্তর দিল—"টাকা রোজগারের চেষ্টায় এসেছি !"

হো-হো করে একটা বিকট হাসি হেসে কেষ্ট বলে উঠল—"বা-রে আমার মাণিক ! টাকা রোজগারের চেষ্টায় গঙ্গার ধারে গিয়ে বসেছিলি ?—টাকা রোজগার করতে চাস তো আমার সঙ্গে চল্। তুই নৌকো বাইতে পারিস্ ?"

নৌকো বাইবার কথা শুনে নিবারণের মনে স্ফূর্ত্তি দেখা দিলে ; ছেলেবেলা থেকে খেলার মধ্যে এইটেই তার প্রধান খেলা ছিল। সে উৎসাহিত হয়ে বলে উঠল—"নৌকো চালানো ? ওঃ, সে আমি খুব পারব।"

কেষ্ট তার পিঠে একটা থাপ্পড় মেরে বল্লে—"তুই ত খলিফা ছেলে দেখছি,—নে, নে, একটু টেনে নে।"

এই টেনে নেওয়ার কথাটার মানে যে কি, নিবারণ ভাল করে বুঝতে পারলে না। সে একটু থতমত খেয়ে নিজের চারপাশটা একবার ভাল করে দেখে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলে—"কি টান্‌ব ?"

গেলাসটা একটু এগিয়ে দিয়ে কেষ্ট বল্লে—"এইটুকু চোঁ-করে মেরে দে।"

নিবারণ মাথা নেড়ে বল্লে—"না আমি খাই না।"

"খাস্‌না ?"—বলেই সে গেলাসটা এক চুমুকে নিঃশেষ করে হাত ধুয়ে তাকে বল্লে—"চল্। পারবি ত ? দেখিস্ !"

নিবারণ জোরে মাথা নেড়ে উত্তর দিলে—"হুঁ, খুব পারব।"

তারপর হোটেল থেকে বেরিয়ে তারা আবার গলি-ঘুঁজি

দিয়ে ঘুরতে-ঘুরতে গঙ্গার ধারে এসে পড়ল। জেটির ধারে একখানা ছোট নৌকো বাঁধা ছিল, তার উপরে তারা চড়ে বসল।

নিবারণের হাতে একটা দাঁড় তুলে দিয়ে কেষ্ট নিজে গিয়ে হালে বসল। তার পর একটু-একটু করে নৌকাখানাকে মাঝ-গঙ্গায় নিয়ে গিয়ে বল্লে—"নে, দাঁড় টান, কিন্তু দেখিস্, বেশী তাড়াতাড়ি করিস্নি। অনেক দূর যেতে হবে, হাঁপিয়ে যাবি।"

—"আচ্ছা" বলে সে আস্তে আস্তে দাঁড় ফেলতে লাগল।

রাত্রির প্রথম-প্রহর তখন প্রায় কেটে গেছে। বর্ষার এক-আধখানা পাতলা মেঘ চাঁদের পাশ দিয়ে দৌড়-দৌড়ি করছে। ক্রমে মেঘগুলো সব একজোট হয়ে চাঁদখানাকে একেবারে ঢেকে ফেল্লে। চারিদিকে অন্ধকার, কেবল দূরে প্রাসাদের মতন বড় বড় জাহাজগুলোর ছোট ছোট জানলা দিয়ে মাঝে মাঝে এক-একটা আলোর টুকরো নদীর জলের উপর লম্বা হয়ে পড়ে তখনি আবার মিলিয়ে যাচ্ছিল। একখানা জাহাজ থেকে একটা তীব্র বাঁশীর আওয়াজ নদীর দুকূল ঝন্‌ঝনিয়ে আবার হাওয়ার গায়ে মিলিয়ে গেল। জাহাজের বাঁশীকে যেন লজ্জা দেবার জন্যেই আকাশ থেকে একখণ্ড মেঘ একটা ছোটখাট হুঙ্কার ছেড়ে তখনি আবার চুপ করলে। মনে হল যেন উপরকার ঐ বিরাট কালো দেহটা নিজের গলাটাকে একটু শানিয়ে নিলে। অন্ধকারে উঁচু-উঁচু জাহাজের

মাস্তুলগুলো দেখে নিবারণ ভয়ে-ভয়ে কেষ্টকে জিজ্ঞাসা করলে —"ওগুলো কি ?"

কেষ্ট ত্রস্তভাবে একবার চারদিকে তাকিয়ে নিয়ে বললে— "কোথায় কি ? নে, নিজের কাজ কর।"

—"ঐ যে উঁচু-উঁচু।"

—"কাব্‌লা ছেলে! ওগুলো জাহাজের মাস্তুল। নে, নে তাড়াতাড়ি বেয়ে চল্।"

জাহাজের ভিড়ের মধ্যে সরু সরু গলির ভিতর দিয়ে তারা সাবধানে বয়ে চলতে লাগল।

কেষ্ট আস্তে আস্তে নিবারণকে বল্লে,—"দ্যাখ্ বেশী সপ্-সপ্ আওয়াজ করিস্‌নি, জাহাজের লোকেরা টের পেলেই বড় ফ্যাসাদ বাধাবে।" তারপর আপনা-আপনি বলতে লাগল,—"ব্যাটারা আজ ভারি ধর-পাকড় সুরু করেছে।

কথাগুলো নিবারণের কানে যেতেই তার বুকটা ছাঁৎ করে উঠল। ভয়ে তার হাত-দুখানা গুটিয়ে আসতে লাগল। আস্তে আস্তে, আওয়াজ না করে দাঁড় ফেল্‌তে ফেল্‌তে কখন্ যে তার দাঁড়-টানা আপনা-আপনি বন্ধ হয়ে গেল সে নিজেই বুঝতে পারলে না। কেষ্ট দাঁত-খিঁচিয়ে বল্লে—"কি, থামলি বড় যে ?"

হঠাৎ তাড়া খেয়ে সে আবার ঝপ্ ঝপ্ করে দাঁড় বেয়ে চলতে লাগব।

এবার কেষ্ট তার জায়গা ছেড়ে উঠে এসে তার সাম্‌নে দাঁড়িয়ে হাত-দুটো নেড়ে-নেড়ে বলতে লাগল—"ফের্ শব্দ

করে! শেষটা নিজেও মরবি! যা বল্‌চি তা যদি না শুনিস্‌ তবে একটি চড়ে কাবার করে দিয়ে এই গঙ্গার জলে তোকে ভাসিয়ে দেব।"

কেষ্টর সেই বিকট হাবভাব দেখে নিবারণের অন্তরাত্মা ক্রমেই শুকিয়ে যেতে লাগল। তার কেবলই মনে ভয় হ'তে লাগল এ কোন্‌ অজানার দিকে সে নৌকো বয়ে চলেছে, যার অলক্ষ্যে চুম্বকের মত একটা বিপদ তাকে আকর্ষণ করছে। আজ্‌কের এই ভীষণ অন্ধকার রাত্রিতে যে লোকটা তার এই নিরুদ্দেশ যাত্রার কর্ণধার, কে জানে সেই বা কে! নানান ভয় ও ভাবনায় বেচারী একেবারে মুস্‌ড়ে পড়ল। আরো-একটু নৌকো বাইবার পর সে কাঁচু-মাঁচু হয়ে জিজ্ঞাসা করলে—"আর কতদূর যেতে হবে?"

সাম্‌নের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টি রেখে কেষ্ট উত্তর দিলে—"আর একটু।"

আরও কিছুক্ষণ দাঁড় ঠেল্‌বার পর কেষ্ট উঠে তাকে বল্লে—"ঘাখ্‌, ঐ যে আলোটা ছাখা যাচ্ছে, ওটা একটা ঘাঁটি, ঐটে, পেরোলেই আর কি—"

আস্তে আস্তে দম বন্ধ করে নিবারণ জায়গাটা পার হয়ে চলে গেল। তারপর একটা সরু জেটির কাছে এসে কেষ্ট নৌকো ভিড়িয়ে নৌকোর খোলের ভিতর থেকে কতকগুলো কি জিনিষ বার করে নিয়ে নেমে গেল। যাবার সময় বলে গেল।—"যতক্ষণ-না আমি আসি এইখানে বসে থাক্‌!"

নিস্তব্ধ সেই জায়গাটায় বসে থাকতে-থাকতে নিবারণের গা ছম্‌ছম্ করতে লাগল। তার বুকের ভিতর এতক্ষণ ভাবনা আর ভয় এই দুটো জিনিষেরই লড়াই চলছিল, এবার ভাবনাটা গিয়ে ভয়টাই তার মনের উপর সওয়ার হয়ে বসল। সে নিজের শরীরটা যতদূর সম্ভব ছোট-করে এককোণে সরে গিয়ে বসল। একবার মায়ের মুখখানা মনে পড়ল, তারপর ছোট-ছোট অনাহারক্লিষ্ট ভাইবোনদের! ভয়ে দুঃখে যখন সে প্রায় আধমরা হয়ে নৌকোর খোলের উপর নিজের দেহটা বিছিয়ে দিয়েছে তখন হাতে একটা পুঁটলি নিয়ে কেষ্ট ফিরে এল।

কেষ্ট নৌকোতে পা দিয়েই নিবারণকে একটা লাথি মেরে বল্‌লে—"চল্, চল্, আর এক-মিনিটও দেরি নয়, পাহারা বদ্‌লাবার আগেই আমাদের ঘাঁটি পেরিয়ে যেতে হবে।"

নিবারণ তাড়াতাড়ি উঠে আবার দাঁড়ে গিয়ে বসল।

নৌকোখানা একটু চলবার পরই কেষ্ট তাকে বল্লে—"তুই বেশ ছোকরা, তোকে আজ্‌কের কাজের জন্যে দশ টাকা দেবো।"

নিবারণ কাঁদ-কাঁদ স্বরে উত্তর করলে—"আমার এক পয়সাও চাই না, আমায় ছেড়ে দাও।" সে মনে মনে এতক্ষণ প্রতিজ্ঞা করেছিল, একবার এই লোকটার পাল্লা থেকে উদ্ধার পেলে, সটান বাড়ী চলে যাবে, সহরে একদণ্ডও আর থাকবে না।

কেষ্ট একটুখানি ভেবে বল্‌লে—"কেন দশটাকা কি কম

হল ? আচ্ছা, য' তোকে আরো পাঁচ টাকা দেবো কিন্তু দেখিস্—আজ্‌কের কথা কাউকে বলিস্‌নি যেন।"

অতগুলো টাকা একসঙ্গে পাবার কথা শুনে নিবারণের একটু লোভ হতে লাগল। পাওয়া দূরে থাক্, অত টাকা পাবার আশা সে করতে পারে-নি। সে মনে-মনে, একটা হিসেব করে দেখলে তাতে তাদের দু-মাস বেশ সুখে চলে যেতে পারবে। কিন্তু ভয়টা তখনও পূরো-মাত্রায় তার মনের উপর রাজত্ব করছিল, কাজেই সে একটা ছোট রকমের 'আচ্ছা' বলে আবার দাঁড়-বেয়ে চলতে লাগল।

একটু এগোবারই পর কেষ্ট হঠাৎ চম্‌কে উঠে তাকে দাঁড় থামাতে বল্লে।

"এই রে, বুঝি দেখতে পেয়েছে ! ঐ ভ্যাখ্, দূরে একটা আলো নাড়চে—দেখেচিস্ ?"

নিবারণ দেখলে নদীর ধারে একটা লাল লণ্ঠন যেন হাওয়ায় দুল্‌চে। তার মনে হতে লাগল বুকের ভিতরের হাড়গুলো যেন খাঁচার পাখীর মতন ছট্‌ফট্ করে পাঁজরা-ভেঙে বেরিয়ে পড়বার চেষ্টা করছে,—ভয়েতে তার সর্ব্বাঙ্গে ঘাম দিয়ে একটা কাঁপুনী ধরল, অজ্ঞাতসারে তার হাত থেকে দাঁড়টা খসে পড়ে গেল। কেষ্ট তখনি দাঁড়টা জল থেকে তুলে নিলে। নিবারণের সেই রকম অবস্থা দেখে তার ভয়ানক রাগ হল, তার পেটের ভিতর থেকে একটা গালাগালির ঢেঁকুর উঠে অস্বাভাবিক আওয়াজ করে হাওয়ায় মিলিয়ে গেল।

নদীর ধারের আলোটা খানিকক্ষণ নড়েচড়ে আবার স্থির হয়ে গেল, নিবারণও একটু প্রকৃতিস্থ হয়ে আবার নৌকা বাইতে আরম্ভ করলে; অন্ধকারে মিশিয়ে তারা ঘাঁটি পার হয়ে গেল।

ভয়ের সীমানা পেরিয়ে আসবার পর নিবারণ যেন একটু ভরসা পেলে। টাকা পাবার লোভটা তখন আর মনের কোণে একটু-একটু করে আবার উঁকি মারতে সুরু করেছে। সে ভাবছিল টাকাগুলো কতক্ষণে পাওয়া যাবে! কিন্তু একেবারে কেষ্টকে কথাটা জিজ্ঞাসা করতে সাহসে কুলোচ্ছিল না; বুদ্ধি খাটিয়ে সে তাই জিজ্ঞাসা করলে,—"ও পুটলিতে কি আছে?"

কেষ্ট উত্তর দিলে—"ওতে কোকেন আছে। ওর দাম কত জানিস্? হাজার টাকার ওপর! আচ্ছা যা—তোকে আরো পাঁচটাকা দেবো—কেমন, খুসি ত?"

পাওনার মাত্রা আরো বেড়ে গেল দেখে তার স্ফূর্ত্তির জোয়ারে নতুন স্রোত এসে লাগল; মনের আনন্দে সে বেয়ে চলতে লাগল।

কেষ্ট জিজ্ঞাসা করলে—"তোর বাড়ী কোথায় রে?"

নিবারণ বল্লে—"বিষ্ণুপুর।"

—"বিষ্ণুপুর! সে ত অনেকদুর রে!" বলেই সে একটা তান ধরে দিলে—"বিষ্ণুপুরের তামাক এনেছি, খাও-সে রাঙ্গা আমোদ করে।"

রাত্রির সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকারও তখন খুব ঘন হয়ে এসেছে,

আকাশে একটা তারাও দেখা যাচ্ছিল না ; রাস্তার আলোগুলো এমন ভাবে জলের উপর এসে পড়েছে যেন আকাশের ঐ সব তারাগুলো নেমে এসে নদীর দুদিকে সার-বেঁধে বসে গিয়েছে। অন্ধকারের বুক ফুঁড়ে তাদের ছোট্ট নৌকাখানা ধীরে ধীরে এগোতে লাগল। দুজনের কারো মুখে কথা নাই ; থেকে-থেকে কেষ্ট এক-একটা গানের এক-আধটা পদ গেয়ে উঠছে,—কোনোটা হাসির, কোনোটা দুঃখের, কোনটা প্রেমের। তার প্রাণের ভিতর স্ফুর্ত্তির যে তুফান বইছিল তারই একটু-আধটু আভাস তার গানের সুর দিয়ে বেরিয়ে পড়ছিল। গান গাইতে গাইতে সে চেয়ে চেয়ে নিবারণকে দেখতে লাগল। হঠাৎ কি মনে করে নিবারণকে জিজ্ঞাসা করলে—"এই টাকা নিয়ে তুই কি করবি ?"

নিবারণ বল্লে—"বাড়ী পাঠাব।"

নিবারণ এমন আকুল-মমতার সঙ্গে বাড়ীর নামটা উচ্চারণ করলে যে কেষ্টর মনের ভিতর কেমনতর একটা ধাক্কা লাগল। কেষ্ট যেন কেমন অন্যমনস্ক হয়ে জিজ্ঞাসা করলে—"বাড়ীতে তোর কে আছে রে ?"

"মা, ভাই, বোন।"—বলেই নিবারণ তাদের সেই দুঃখের সংসারের কথাগুলো খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে বলতে সুরু করলে। এতক্ষণ পরে দুঃখ জানাবার একজন লোক পেয়ে তার মন খুলে গেল। একই কথা একশবার করে বলেও যেন তার ভাল করে বলা হচ্ছিল না। নিবারণের সেই ব্যাকুল কথার ভিতর থেকে সেই

নিস্তব্ধ অন্ধকারের গায়ের উপর একটি করুণ ছবি ফুটে উঠে কেষ্টর মনকে কেমন উতলা করে তুলতে লাগল। কেষ্ট সেই ছবিটাকে মন-থেকে ঝেড়ে ফেলবার চেষ্টা করতে লাগল কিন্তু কিছুতেই সেটা গেল না। গঙ্গার জলস্রোতের সঙ্গে নিবারণের কণ্ঠস্বর মিশে কেমন-একটা কান্নার মত সুর তুলতে লাগল যাতে কেষ্টর বুকের ভিতরটা ঝির্ ঝির্ করে কাঁপতে লাগল।

বাড়ী! বাড়ী ছেড়ে আজ কতদিন সে এসেছে। এই নিবারণেরই মত সেও অর্থের চেষ্টায় বাড়ী ছেড়ে এসেছিল। তারপর? তারপরের কথা মনে করতে গিয়ে কেষ্টর বুকের ভিতরটা টন্‌টন করে উঠল। সে চোখ বুজে অসাড় হয়ে পড়ে রইল;—নৌকা ধীরে ধীরে চলতে লাগল।

বাড়ীর কথা ত তার মনে ছিল না, আজ কতদিন হ'ল তার স্মৃতি থেকে বাড়ীর ছবি একেবারে মুছে গেছে। তার পর থেকে তা মনে করবার তার অবসরই হয়নি—কেউ মনে করিয়েও দেয়নি। তার এই জীবনের মধ্যে যারা সঙ্গী ছিল তাদের কারোর মুখে সে কখনো বাড়ীর কথা শুনেনি। আজ হঠাৎ এই নিবারণ কোথা থেকে এসে তাকে বাড়ীর কথা মনে করিয়ে দিলে! তার ঐ গলার সুরে, তার ঐ মুখের ভাবে কি ছিল যাতে কেষ্টর সমস্ত হৃদয়টা তোল্‌পাড় করে উঠল। সে চুপ্‌টি করে পড়ে সেই কথা ভাবতে লাগল। অনেক দিনের অনেক পুরোণো ছবি অস্পষ্টতার কুয়াসা ঠেলে তার চোখের সাম্‌নে উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠতে লাগল।

নিবারণ দাঁড় টান্‌তে টান্‌তে ভাবছিল টাকার কথা। সহরে এসে কি করে টাকা উপায় করবে এই তার ভাবনা ছিল। সে কি জানে যে কিছু করবে ? সামান্য এই নৌকা চালানো—যা ছেলেবেলায় সে খেলাচ্ছলে শিখেছিল—তাই তার সৌভাগ্যের পথ খুলে দিলে ভেবে সে যেমন আশ্চর্য্য হচ্ছিল তেমনি তার আহ্লাদও হচ্ছিল। টাকাগুলো হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করবার জন্যে তার প্রাণটা ছট্‌ফট্‌ করতে লাগল। সে আর থাকতে না পেরে বলে ফেল্‌লে—"টাকাটা কখন্‌ দেবে ?"

কেষ্টর প্রাণে তখন জাগছিল জল-ভরা ডব্‌ডবে দুটি চোখ,—কি বেদনা, কি মর্ম্মব্যথা সেই দু'টি চোখ দিয়ে প্রকাশ পাচ্ছিল ! টাকার কথা কিছু না বলে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে নিবারণকে বল্‌লে—"নিবারণ, তুই বড় ভাল ছেলে রে, আমার আজ যা উপকার করলি—"

আর নিবারণ ভাবছিল, বেশ ব্যবসা ত ! খাটুনি নেই, কিছু নেই, এক রাতেই এত টাকা ! এক মাসের ভিতরেই বড় লোক !

আরো অনেকক্ষণ বেয়ে আসার পর তারা একটা জায়গায় এসে নৌকো থামিয়ে ফেল্‌লে। কেষ্ট নিবারণকে বললে—"সারা-রাত্রি ঘুমোস নি, এখন একটু ঘুমিয়ে নে, আমার আসতে একটু দেরি হবে, কোথাও যাস্‌নে যেন।"

নিবারণের ক্লান্ত দেহটা এলিয়ে আসছিল, সে গুঁড়িগুড়ি

মেরে নৌকোটার ভিতর শুয়ে পড়ল। কেষ্ট একলাফে নৌকো আর ডাঙার ব্যবধানটুকু পেরিয়ে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

কেষ্ট যখন আবার নৌকোয় ফিরে এল তখন সকাল হয়ে গিয়েছে। সে নিবারণের গায়ে ধীরে ধীরে হাত বুলিয়ে তাকে তুলে দিয়ে পকেট থেকে একতাড়া নোট বার করে তার হাতে দিয়ে বল্লে—"নিবারণ, তোকে এই একশো টাকা দিলুম। এখুনি বাড়ীতে পাঠিয়ে দে! তুই আমার বড় উপকার করেছিস্ রে।"

নিবারণ নোটগুলো হাতে করে তুলে নিলে। তার হাত ঠক্-ঠক্ করে কাঁপতে লাগল।......

এই তার সহরের প্রথম অভিজ্ঞতা, এই তার প্রথম রোজগার। এমন সহজে যে এত রোজগার হ'তে পারে এ কথা নিবারণ কোনোদিন কল্পনায়ও আনতে পারেনি। এর মধ্যে একটু ভয় আছে বটে, কিন্তু সে ভয়কেও তো এড়ানো যায়—কেষ্ট তা প্রমাণ করে দিয়েছে। আর ঐ ভয়টুকুর যে পুরস্কার সে তো সামান্য নয়! কাজেই রোজগারের এই পথ নিবারণকে প্রলুব্ধ করে তুল্লে। পরদিন কেষ্টর খোঁজে সে সন্ধ্যাবেলা থেকেই গঙ্গার ধারে এসে বসে রইল! কেষ্ট আর এলনা বটে, সে কিন্তু তাই বলে কেষ্টর সেই নৌকাখানার মালিকের অভাব হলনা। রাতদুপুরে কেষ্টরই মত একটা লোক এসে যখন সেটাতে চড়ে বসল তখন নিবারণ স্বেচ্ছায় তার কর্ণধার হ'ল। এমনি করে তার ব্যবসার সূত্রপাত হ'ল।

এবং কেষ্টর সঙ্গে সে যে-যাত্রা সুরু করেছিল তারই আবৃত্তি রাতের পর রাত ধরে চলতে লাগল। ক্রমে সে চাকর থেকে মনিবের দলে গিয়ে উঠল। আশাতিরিক্ত অর্থ উপার্জ্জন হতে লাগল। মা-ভাই-বোনের দুঃখ দূর হ'ল। তখন মাসে মাসে যথাসময়ে বাড়ীতে টাকা পাঠাতে পারিলেই সে নিশ্চিন্ত হ'ত। তার পর সে নিশ্চিন্ত-মনটাকে নিয়ে সে যা খুসি-তাই করতে লাগল। ক্রমে এই নিশ্চিন্ততার ফাঁক দিয়ে মা-ভাই-বোনের মুখ যে কবে সরে পড়ল, সে তা টেরও পেলেনা। যারা তার সঙ্গী ছিল তাদের কারো কোনো দায় ছিলনা। একটা দায় ঘাড়ে করে থাকাকে তারা পরিহাস করত। ক্রমে নিবারণেরও সেইটে সহজ অবস্থা হয়ে এল। তখন জীবনের মধ্যে যা রইল তা কেবল ঐ অন্ধকার রাত্রের কাজ, আর হল্লা-করে স্ফূর্ত্তি করা!

* * * *

আদালতে সেদিন কয়েকটা পাকা বদমায়েসের বিচার হচ্ছিল। আসামীদের মধ্যে নিবারণকেও ধরে আনা হয়েছে। এখানে এই তার প্রথম আসা। এতদিন সে স্ফূর্ত্তি করে ব্যবসা চালিয়ে আসছিল ;—ভয় একটা ছিল বটে, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত সেই ভয়ের চেহারাটার সঙ্গে এমন চাক্ষুষ পরিচয় হয়নি। আজ কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে তার ব্যবসার ফাঁকে-ফাঁকে কী-সব ভয়ঙ্কর বিপদ জড়িয়ে আছে তা প্রত্যক্ষ হয়ে উঠে, তার সর্ব্বাঙ্গ শিউরে উঠতে লাগল। তার মনে হতে লাগল এই সব বিপদের

সঙ্গে গা-ঘেঁসাঘেঁসি করে সে কি-করে এতদিন কাটিয়ে এসেছে ! উঃ !

নিবারণের চোখের সাম্‌নে তার সঙ্গীদের জেল হয়ে গেল। প্রমাণ-অভাবে সে-ই কেবল ছাড়া পেলে। সে তাড়াতাড়ি কাঠগড়া থেকে বেরিয়ে নীচে নেমে এল। দরজার সাম্‌নে জেলখানার গাড়ি দাঁড়িয়ে। কতবার এই গাড়ীখানার কথা সে বন্ধুবান্ধবদের কাছে শুনেছে। কৌতুহলের ঝোঁকে অন্য-লোকদের মত সেও সেখানে দাঁড়িয়ে গেল। খানিক পরে হাতকড়া-লাগানো তার বন্ধুদের পিঠে রুলের গুঁতো মারতে-মারতে গোরা পুলিশ সেই গাড়ীখানার অন্ধকার গহ্বরের মধ্যে তাদের ধাক্কা মেরে তুলে দিতে লাগল। তাই দেখে নিবারণের বুকটা ছাঁৎ করে উঠল। উঃ, ওই গাড়ীটার ভিতর কি ঘুট্‌ঘুটে অন্ধকার !—একটু আলো নেই, বাতাস ঢোকার পথও বন্ধ ! উঃ, জেল !—

তার পা-দুটো থর-থর করে কাঁপতে লাগল। একদণ্ডও আর সেখানে দাঁড়াতে না পেরে সেখান থেকে সে সরে পড়ল। তারপর আস্তে-আস্তে হাবড়ার পুলের কাছে এসে দাঁড়াল।

পুলের দুদিক দিয়ে লোক চলেছে। নীচেকার জলস্রোতের মতন উপরকার জনস্রোতেরও বিরাম নেই। নিবারণ অন্যমনস্কে দাঁড়িয়ে তাই দেখতে লাগল। হঠাৎ কে যেন তার নাম ধরে ডাকলে—"কিরে নিবারণ, চিনতে পারিস্‌ ? ওঃ, কত বড় হয়ে গেছিস্‌ রে !—আমি কেষ্টরে—কেষ্ট !"

নিবারণ প্রথমটা তাকে চিনতে পারেনি। সে নিজের নাম বলতেই তাকে চিনে ফেল্লে।

—"কেষ্ট! ওঃ তোমাকে সেই দেখেছিলুম; কতদিন দেখা হয়নি।"

নিবারণ কেষ্টকে বহুদিনের পুরানো বন্ধুর মত হাত ধরে টেনে নিয়ে চলতে লাগল।

কেষ্ট তাকে জিজ্ঞাসা করলে—"তারপর; কেমন আছিস্?"

কেষ্টকে পেয়ে নিবারণের মন যেন আবার চাঙ্গা হয়ে উঠল। সে তার হাত ধরে টান্তে-টান্তে কাছাকাছি একটা হোটেলে নিয়ে গেল। হোটেলওয়ালাকে খাবার দিতে বলে নিবারণ কেষ্টকে নিয়ে একটা পর্দ্দা-ঘেরা ঘরের ভিতর গিয়ে বসল। তারপর একটা চাকরকে ডেকে বলে দিলে—"ওরে একটা পাঁট্ নিয়ে আয় ত।"

দুটো গেলাসে মদ ঢেলে নিবারণ একটা কেষ্টর সামনে এগিয়ে দিয়ে বললে—"নাও দাদা, টেনে নাও।"

কেষ্ট একটু অপ্রস্তুত-ভাবে বলে উঠল—"না ভাই, ও-সব ছেড়ে দিয়েছি।"

নিবারণের বুকের ভিতর দিয়ে ছুঁচের মতন কি একটা তীক্ষ্ণ জিনিষ যেন ফুঁড়ে বেরিয়ে গেল। কেষ্ট মদ ছেড়ে দিয়েছে? যদিও কেষ্টর সঙ্গে তার মোটে একরাত্রির পরিচয় কিন্তু সেই একরাত্রেই সে তাকে যতটা চিনেছিল ততটা বোধ হয় আর-কাউকে চিনতে পারে নি। তার কথাটা নিবারণের

কাছে একটা রহস্যের মত ঠেক্‌ল ; সে একটু অভিমানের সুরে বল্লে—"খাবেনা ?"

কেষ্ট একটা তাচ্ছিল্যের ভাব দেখিয়ে বল্লে—"না ; তুই খা-না।"

—"আচ্ছা বেশ, তবে আমিই খাই।" বলে উপরি-উপরি দুটো গেলাসের মদ চোঁ-চোঁ করে দু-চুমুকে সাবাড় করে ফেল্লে।

কেষ্ট হাসতে-হাসতে বল্লে—"খুব ওস্তাদ হয়েছিস্ যে রে !"

নিবারণের মুখের উপর থেকে মদের তীব্র আস্বাদনের বিশ্রী ছবিটা তখনো একেবারে মিলিয়ে যায় নি ; একটা হাঁসের ডিমের আধখানা কামড়ে নিয়ে সে বল্লে—"ওস্তাদ ত তুমিই করেছ দাদা।"

নিবারণের এই কথাগুলো কেষ্টর বুকে হঠাৎ একটা ধাক্কা দিলে। সে নিবারণের ভাব-ভঙ্গী কথাবার্তা যতই দেখতে লাগল ততই অবাক হয়ে যেতে লাগল। তার মনে হতে লাগল—সেদিনকার সেই ছোঁড়াটা ! মদের নাম শুনে যার মুখ সিঁটকে উঠত—আজ তার এ কী !

হঠাৎ নিবারণ তাকে জিজ্ঞাসা করলে—"আজকাল কি হচ্ছে ?"

কেষ্ট বল্লে—"চাষবাস সুরু করেছি !"

নিবারণ অবাক হয়ে বল্লে—"অ্যাঁ, চাষবাস !"

কেষ্ট বল্লে—"হ্যাঁ। তাতে আমার দিন বেশ কাটচে।"

নিবারণ তার মুখের দিকে চেয়ে দেখ্‌লে বেশ-একটা তৃপ্তি এবং নিশ্চিন্ততায় সে মুখখানি ভরে আছে। সমস্ত শরীরের উপর একটি আরামের আবেশ বিছিয়ে রয়েছে। নিবারণ বারবার তাকে দেখতে লাগল। তার মনে জেগে উঠল আজকের আদালতের তার সঙ্গীদের সেই অবস্থা, তার নিজের সেই ভয়ের উৎকণ্ঠা! এতদিন সে ও-সব কিছু ভাবেনি, কিন্তু আজ আদালত থেকে বেরিয়ে পর্য্যন্ত তার বুকটা থেকে থেকে দুর্‌-দুর্‌ করচে।

কেষ্ট বল্লে—"বড় বেঁচে গিয়েছি নিবারণ! সব ছেড়েছুড়ে বাড়ী না গেলে জাহান্নামে গিয়েছিলুম আর কি!"

জাহান্নামে! নিবারণের বুকটা কেমন ধড়্‌ফড়্‌ করে উঠল। সে আর এক গেলাস মদ এক-চুমুকে টেনে নিয়ে বল্লে—"হঠাৎ কাজ-গুটিয়ে পালালে যে?"

কেষ্ট বল্লে—"এখানে আর মন টিকল না। মনে আছে তোর সেই-রাত্রের কথা—যেদিন তোকে নিয়ে নৌকোয় বেরিয়েছিলুম?—তুই তোর বাড়ীর কথা বল্‌তে লাগলি, আর আমারও বাড়ীর জন্যে প্রাণটা কেঁদে উঠল। কাজ-কর্ম্ম ভাল লাগল না।"

নিবারণ আর-এক গ্লাস মদ নিঃশেষ করে একটা গম্ভীর শব্দে "হুঁ" বলে, ঠক্‌ করে গ্লাসটা টেবিলের উপর আছ্‌ড়ে রাখলে। সে যতই কেষ্টর সেই নিশ্চিন্ত মূর্ত্তি দেখতে লাগল ততই কেমন-একটা হিংসের তার শরীরের মধ্যে জ্বালা ধরতে লাগল। সে সেই জ্বালার উপর প্রাণ ভরে মদের ধারা ঢালতে লাগল।

দুজনে খানিকক্ষণ চুপচাপ হয়ে রইল। তারপর কেষ্ট স্নেহের স্বরে জিজ্ঞাসা কল্লে—"বাড়িতে টাকা পাঠাচ্ছিস্ ত নিবারণ ?"

কেষ্টর মুখে এই বাড়ীর কথায় নিবারণের দেহের রক্ত যেন সাপের মত এঁকে-বেঁকে তার মাথার ভিতরে গিয়ে জমা হতে লাগল। তার মনে জাগতে লাগল সেদিনকার কথা—যেদিন এই লোকটার সঙ্গে ভীষণ অন্ধকার রাত্রিতে নৌকো বেয়ে সে চলেছিল, সেদিনকার জীবন-যাত্রায় এই লোকটাই ছিল কর্ণধার! আজ তাকে মাঝ-দরিয়ায় ফেলে সে কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে! আর সে নিজে কোথায় এসে পড়েছে! কেষ্ট যাকে বল্লে জাহান্নাম—তারই ত পথে! কে তাকে এখানে এনে ফেল্লে? এখন কোথায় পড়ে আছে তার সেই মা, তার সেই ভাই-বোন —যাদের দুঃখ দূর করবার জন্যে সে বাড়ী ছেড়ে বেরিয়েছিল!

কেষ্টর দিকে চেয়ে-চেয়ে তার মনে হতে লাগল, কেষ্ট যেন দূরে দাঁড়িয়ে তার অবস্থাটা দেখে মুচ্‌কে-মুচ্‌কে হাসছে। তার সেই হাসিতে নিবারণের মনে হল যেন সমস্ত পৃথিবীতে আগুন ধরে উঠল। দেখতে-দেখতে তাদের সেই গ্রাম, তাদের সেই বাড়ী, তার ভাই-বোন-মা সবাই যেন পুড়ে ছাই হয়ে গেল! চোখের সামনে জাগতে লাগল কেবল শূন্যতার অন্ধকার!

প্রাণপণ-শক্তিতে সেই শূন্যতার ভিতর দিয়ে চোখ-দুটোকে ঠেলে বার করে নিবারণ কেষ্টকে দেখতে লাগল।

তার সেই-রকম চাহনি দেখে কেষ্ট ভয়ে-ভয়ে ভাঙা চেয়ারটা একটু পিছনে সরিয়ে নিয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করলে—"কিরে মারবি নাকি ?"

কি করলে যে নিবারণের মনের ঐ জ্বালাটা দূর হয় সে এতক্ষণ ঠিক করতে পারছিল না ; হঠাৎ কেষ্টর মুখে মারের কথা শুনে সে যেন একটা উপায় দেখতে পেলে। দাঁতের উপর দাঁত দিয়ে সে বল্লে—"মারলেও তোর যথেষ্ট সাজা হয় না, আমার কি করেছিস জানিস্ ?"

কেষ্ট তাড়াতাড়ি চেয়ার ছেড়ে উঠে বল্লে "বেশী চালাকি করিস্ নি, এখুনি পুলিস ডেকে দেবো ; নেশা ছুটে যাবে।"

—"পুলিশ দরকার হবেনা"—বলেই সে বাঘের মত লাফিয়ে গিয়ে কেষ্টর টুঁটিটা চেপে ধরলে।

তারপর ধুপ্‌ধাপ্ আওয়াজ, গেলাস ভাঙবার ঝন্-ঝন্-শব্দ, গোলমাল, লোকজনের হাঁকাহাঁকির ভিতর কখন্ যে কি হয়ে গেল তা তাদের দুজনের কেউ ঠিক করে বলতে পারেনা।

তারপর নিবারণকে যখন জমাদার এসে ধরলে তখন তার কথা এড়িয়ে এসেছে, ভাল করে দাঁড়াতে পাচ্ছে না। পাহারাওয়ালার গুঁতোর চোটে মাঝে-মাঝে তার চেতনা ফিরে আসছিল, আবার তখুনি তাদের গায়ে নেতিয়ে ঢলে পড়ছিল। খানিকটা হিচড়ে আর খানিকটা কোল-পাঁজা করে তাঁরা তাকে টেনে নিয়ে চল্‌ল।

কেষ্ট দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে এই দৃশ্য দেখছিল। নিবারণের পিঠে রুলোর গুঁতোগুলো যেন দ্বিগুণ জোরে এসে তার বুকে বাজতে লাগল ; তার মুখের অস্ফুট এড়ানো কথাগুলো সহস্র অর্থ নিয়ে তার কানে এসে ঢুকতে লাগল। পথ-চলতি অনেক লোক সেখানে দাঁড়িয়ে তামাসা দেখছিল, কেউ বুঝুক আর না-বুঝুক সে কিন্তু কথাগুলোর মর্ম্ম বুঝিতে পারছিল। ভিড় ঠেলে সে একটু ফাঁকে এসে দাঁড়াল। নিবারণের সঙ্গে তার সেই প্রথম দেখার দিনের কথা মনে পড়ল, তার সেই ফুঁপিয়ে কান্না, সেই সরল হাব ভাব, সেই ত্রস্ত সভয় মুখ—সমস্ত ছবিগুলো তার চোখের সাম্‌নে এক-এক করে ফুটে উঠতে লাগল। ...

দিনকয়েক পরে এই মারপিটের মোকদ্দমা উঠল। নিবারণের সাম্‌নে যখন জেলের ছবি জাজ্বল্য হয়ে উঠছে, এমন সময় কেষ্ট সাক্ষী দিতে এল। সবাই ভাবলে এইবার নিবারণের দফা শেষ! কিন্তু তার সাক্ষীতেই মোকদ্দমা একেবারে কেঁসে গেল। নিবারণ বেকসুর খালাস পেয়ে বেরিয়ে এল।

রাস্তায় বেরুতেই কেষ্ট ছুটে এসে নিবারণের হাত-দুটো চেপে বল্লে—"চল ভাই, আমার সঙ্গে চল।"

নিবারণ তার দিকে কট্‌মট্‌ করে চেয়ে সজোরে হাত ছিনিয়ে নিয়ে জনস্রোতের মধ্যে মিলিয়ে গেল।

কেষ্ট নিরুপায় হয়ে শূন্যের দিকে তাকিয়ে রইল।

দিগ্বিজয়ী

মহম্মদ শাহের মৃত্যুর সঙ্গে-সঙ্গে সঙ্গীতেরও সমাধি হ'য়ে গেল। মনে হ'ল, যেন যমুনার উচ্ছল, উদ্দাম গতি থেমে গিয়ে, হঠাৎ তার বুক ফুঁড়ে, একটা বিশ্রী বালির চড়া ফুটে উঠ্‌ল। হাজার বৎসর ধ'রে হিন্দু-মুসলমানের সমবেত চেষ্টায় আর্য্যাবর্ত্তে যে সুরের প্রাসাদ তৈরি হ'য়ে উঠেছিল, তার অভ্রভেদী গম্বুজের চূড়ার ঠিক ওপরেই যে আকাশের বাজ বাসা ক'রে বসেছিল, সেটা কেউ বুঝ্‌তে পারে নি। আত্মীয়-স্বজনের সহস্র আদর ও ভালবাসার অবিরাম বর্ষণ সত্ত্বেও, মাতৃহীনের বুকের ভেতর যেমন একটা ক্ষুধাতুর খালি জায়গা প'ড়ে থাকে, বাদশার মৃত্যুর পর সঙ্গীতকে জাগিয়ে তোলবার অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও, সহরের সঙ্গীত-পিপাসুদের প্রাণের মধ্যে তেমনি একটা জায়গা হা-হা কর্‌তে লাগ্‌লো। যেখানে প্রতি সন্ধ্যায় চাঁদনী-চকের সামান্য দরজীর দোকান থেকে আরম্ভ করে, শাহান্‌শার দরবার অবধি কণ্ঠ ও যন্ত্র-সঙ্গীতে মুখরিত হ'য়ে উঠ্‌ত, একটীমাত্র লোক চলে যাওয়াতে সেখানকার সমস্ত আনন্দ একেবারে থেমে গেল।

বাদশার মৃত্যুর সঙ্গে-সঙ্গে অন্য-অন্য সৌখীনদের সখও কমে এল; বড় বড় ওস্তাদদের সঙ্গীত-প্রতিভা জঠরাগ্নির তাপে শুকিয়ে উঠ্‌তে লাগ্‌ল। কেউ-কেউ বিরক্ত হ'য়ে অন্য জায়গায়

চাকরী নিয়ে চলে গেলেন ; কেউ বা গান-বাজনা ছেড়ে দিয়ে অন্য ব্যবসা ধর্‌লেন। দুই-একজন সৌখীন লোকের বৈঠকে মাঝে-মাঝে 'জল্‌সা' চল্‌তে লাগল বটে, কিন্তু দিল্লীশ্বরের মুক্ত-হস্ত মুহুর্মুহু যাদের ভাণ্ডার পূর্ণ করেছে, ছোট-খাটো রহিস্‌দের অনুগ্রহ-ভিখারী হ'য়ে থাকা তাদের অপমানজনক বোধ হ'তে লাগ্‌ল।

দিল্লীতে সে সময় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বাজিয়ে ছিল সের খাঁ। সমস্ত ভারতবর্ষে এমন গাইয়ে-বাজিয়ে কেউ ছিল না, যে সের খাঁকে না চিন্‌ত। দরবারে সে যে-দিন বাজাত, সে-দিন ত দূরের কথা তার পরেও ছয় সাত দিন আর কারো বাজনা আসরে তেমন জম্‌তো না। অন্য জায়গা থেকে বড়-বড় গাইয়ে-বাজিয়েরা এসে যখন দিল্লীর সঙ্গীতের গরিমা ক্ষুণ্ণ ক'রে দেবার উপক্রম কর্‌ত, দিল্লীর বাদশার মান সে সময় সের খাঁ না হ'লে বজায় থাকা মুস্কিল হ'য়ে পড়্‌ত। সমস্ত ভারতে সের খাঁর বাজনার কথা প্রবাদের মত রটে গিয়েছিল ; লোকে বল্‌ত, সে যখন বাজায়, তখন স্বয়ং সরস্বতী তার কাছে এসে বসেন।

সে সময়ে ভারতবর্ষে দাক্ষিণাত্যে আর একটী প্রতিভাবান্ গাইয়ে-বাজিয়ের দল তৈরি হ'য়ে উঠেছিল। তাদের প্রধান আড্ডা ছিল হায়দ্রাবাদে। সঙ্গীতের আলোচনা নিয়ে দুই দলে তুমুল তর্কযুদ্ধ চল্‌ত, কেউ কাউকে মান্‌ত না। দিল্লী থেকে গান-বাজনার চর্চ্চা উঠে যাবার সঙ্গে সঙ্গে, হায়দ্রাবাদের দল মাথা-ঝাড়া দিয়ে উঠ্‌ল। শুধু তাই নয়, তারা দিল্লীর বড় বড়

ওস্তাদদের মাইনে ক'রে নিজের দরবারে রেখে দিল্লীর মুখে চুণ-কালী লাগিয়ে দিতে লাগ্‌ল।

সের খাঁকে এই সময় চারিদিক থেকে সৌখীনেরা অনেক টাকার প্রলোভন দেখিয়ে ডাকাডাকি করতে লাগল; কিন্তু সে দিল্লীর মায়া কাটিয়ে কোন জায়গায় যেতে পার্‌লে না—সংসারের সঙ্গে হিসেব চুকিয়ে দিয়ে সে সুর-বাহার নিয়ে নিজের ঘরে এসে বস্‌ল। পৃথিবীতে বন্ধু, সহায়, সম্পদ বল্‌তে তার যা কিছু ছিল,—সে তার বিবি মুন্না, আর বাদশার নিজের হাতে উপহার দেওয়া সুর-বাহার। তার বাজনার কদর তার বিবি যতটা কর্‌ত, বাদশাও ততটা কর্‌তে পার্‌তেন না। সকাল-সন্ধ্যে সে সুর-বাহারে রাগিণী ভাঁজত, মুন্না ব'সে-ব'সে শুন্‌ত, আর ভাব্‌ত—মিয়া বোধ হয় কোন দেবতা, তা না হ'লে মানুষের হাতে এমন বাজনা কখনো বেরোয়?

বিদেশের দুই-একজন বড়লোক প্রায়ই সের খাঁর বাজনা শোনবার জন্য তার কাছে লোক পাঠাত; কিন্তু মুন্না তাকে কোথাও যেতে দিত না। সে যেতে চাইলে মুন্না বল্‌ত, "এই বুড়ো বয়সে কোথায় যাবে? সেখানে কি তোমার গুণের আদর কর্‌বার মতন সমজদার আছে? বৃদ্ধ মুন্নার মুখের দিকে চেয়ে-চেয়ে ভাব্‌ত,—তাই ত, এমন সমজ্‌দার কোথায় পাব!

এই সময় হায়দ্রাবাদে চান্দোলাল নামে একজন বিখ্যাত ধনী লোক ছিলেন। তাঁর গান-বাজনার খুব সখ ছিল। শুধু গান-বাজনা নয়, তাঁর মতন দাতা সে সময় আর ছিল না। এই

চান্দোলাল দাক্ষিণাত্যের প্রায় সমস্ত বড় ওস্তাদদের মাইনে ক'রে রেখেছিলেন। দিল্লীর ওস্তাদরা যখন ছত্রভঙ্গ হ'য়ে পড়্‌ল তখন তাদের মধ্যে অনেকেই এসে চান্দোলালের অধীনে চাকরী নিয়ে হায়দ্রাবাদে বাস করতে লাগল। দিল্লীর সঙ্গে হায়দ্রাবাদের অনেকদিন ধ'রে যে একটা রেশারেশি চ'ল্‌ছিল, এতদিন পরে সেটা বড় বিশ্রী আকার ধারণ কর্‌লে। হায়দ্রাবাদের ওস্তাদরা নিজেদের কোটে পেয়ে দিল্লীর ওস্তাদদের যখন-তখন নির্য্যাতন ও অপমান করত; আর দিল্লীর ওস্তাদরা পেটের দায়ে সেই সব নির্য্যাতন নীরবে হজম ক'র্‌ত। সাত-শ মাইল দূরে থাকলেও সের খাঁর কাণে দিল্লীর এই অপমানের কথাগুলো এসে পৌঁছতে দেরী হোত না;—অপমানে বৃদ্ধের আপাদ-মস্তক জ্বলে উঠ্‌ত।

এক দিন সে মুন্নাকে বল্লে -"একবার ছেড়ে দাও,—যাই একবার, দক্ষিণের গুমর ভেঙ্গে দিয়ে আসি। দিল্লীর অপমান, আমাদের বাদশার অপমান আর ত সহ্য হয় না।" তার উত্তরে মুন্না যে সব কথা বল্‌ত, সাত-শ মাইল দূরে হায়দ্রাবাদী ওস্তাদদের কানে সেগুলো পৌঁছিলে তারা যে সের খাঁর চেয়ে বেশী চঞ্চল হোয়ে উঠ্‌ত, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তাদের সৌভাগ্য যে সে সব কথা হায়দ্রাবাদে পৌঁছিত না।

চান্দোলালের দরবারে দিল্লীওয়ালারা প্রায়ই সের খাঁর নাম করত,—হুজুরকে জানাত, যদি শুন্‌তে হয় ত সের খাঁর বাজনা। চান্দোলাল অবজ্ঞার হাসি হেসে নিজেদের দলের দিকে চেয়ে

দেখ্‌তেন। খোসামুদের দল তখনি হাত নেড়ে ব'লে উঠ্‌ত, অনেক খাঁকেই দেখা গেল,—এখন বাকী আছে সের খাঁ!

মহম্মদ শাহের সেই প্রশান্ত মুখ মনে পড়ে' দিল্লীর ওস্তাদদের মাথা হেঁট হোয়ে যেত, চোখে জল আস্‌ত।

সের খাঁর গুণ-গান শুন্‌তে-শুন্‌তে এক দিন চান্দোলালের সত্যিই তার বাজনা শোনবার ইচ্ছা হ'ল। তখনি তাকে নিয়ে আস্‌বার জন্য হায়দ্রাবাদ থেকে দিল্লীতে লোক ছুটল।

হায়দ্রাবাদ থেকে তলব এসেছে শুনে সের খাঁ বেচারী একটু ফাঁপরে পড়ে' গেল। তার হায়দ্রাবাদ যাবার ইচ্ছা মনে-মনে ছিল; কিন্তু মুন্নাকে রেখে কেমন ক'রে যাবে, এই ভাবনাটা এতদিন কিছু করতে দেয় নি। চান্দোলালের লোককে সে বল্লে, "দুই-এক দিন সবুর কর, যদি বন্দোবস্ত করতে পারি ত তোমার সঙ্গেই চলে যাব।"

কি করে মুন্নার কাছে কথাটা পাড়বে, সেই ভাবনায় সের খাঁ দিন-রাত ছটফট্ করতে লাগল। একদিন সন্ধ্যাবেলা বাজনার সুর বাঁধ্‌তে-বাঁধ্‌তে সে মুন্নাকে বলে ফেল্লে, "ক'দিন থেকে হায়দ্রাবাদের লোক আসা-যাওয়া করছে—" মুন্না স্বামীর বিছানার একপাশে একটা বালিস নিয়ে শোবার যোগাড় কর· ছিল,—হায়দ্রাবাদের নাম শুন্‌তেই তার বুকের ভেতরটা ছ্যাঁৎ করে উঠ্‌ল। তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে সে জিজ্ঞাসা করলে—"কোথা থেকে লোক এসেছে?"

"হায়দ্রাবাদ থেকে।"

"কেন ?"

"আমাকে নিয়ে যাবার জন্য।"

বিচ্ছেদ-ভয়-কাতরা মুন্নার মুখ দিয়ে আর কথা বেরুল না। সে ভাবতে লাগল—হায়দ্রাবাদ, সে কতদূর যেতে-আস্‌তেই ত লোকের ছ'মাস কেটে যায়। সেখানে গেলে আর কি দেখা হবে ? হয় ত আর তারা আস্‌তে দেবে না,—বোধ হয় আর দেখাও হবে না। ভাবতে-ভাবতে তার চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল।

সের খাঁ তখন আফিংয়ের রঙ্গিন নেশায় স্বপ্ন দেখ্‌ছিল,—জগতের যত গুণী লোক তার তারিফ কর্‌ছে। কেউ বা গায়ের জামেয়ার, কেউ বা গলার হার খুলে দিচ্ছে। ঝোঁকের মাথায় হঠাৎ একটা আনাড়ি রকমের মোচড় দিতেই, পঞ্চমের তারটা পট্‌ করে ছিঁড়ে গেল। সে মুখ তুল্‌তেই দেখ্‌তে পেলে, মুন্নার গাল বয়ে জল পড়ছে। মুন্নার চোখের জল দেখেই তার নেশা-টেশা সব ছুটে গেল। সে তাড়াতাড়ি তাকে আশ্বস্ত করে, তার চোখের জল মুছিয়ে দিলে ; তার কাছে প্রতিজ্ঞা করে ফেল্লে, সে কখনও সেখানে যাবে না। সে দিন আর তার বাজনা হোল না। সুর-বাহারকে সেই রকম অবস্থায় রেখে দিয়ে সে মুন্নার সঙ্গে গল্প আরম্ভ করল। সে-দিন যদি লুকিয়ে কেউ তার গল্প শুন্‌ত, তবে মনে হত, সের খাঁ বুড়া বয়সে নিশ্চয় ক্ষেপে গিয়েছে।

পরের দিন চান্দোলালের লোককে সের খাঁ বলে দিল যে,

সে যেতে পারবে না। চান্দোলালের অনুচরেরা কারণ জিজ্ঞাসা করায় সে উত্তর দিলে, সেখানে সমজ্‌দার কে আছে? তার বাজনার তারিফ করতে পারে এমন লোক দক্ষিণে নেই। সমস্ত সহরে কিন্তু রটে গেল, বুড়া বয়সে সের খাঁ বিবির মায়া কাটিয়ে যেতে পারলে না।

সে-দিন চান্দোলালের দরবারে একজন বিখ্যাত বীণকারের মুজরা ছিল। সহরের যত বড়-বড় গুণী ও ধনী তার দরবারে হাজির,—বীণের আওয়াজে আসর একেবারে জম্‌জম্ করছে, এমন সময় দিল্লী থেকে সের খাঁর খবর নিয়ে লোক ফিরে এসে বল্লে, "সের খাঁ বলে দিয়েছে, তার মতন লোক চান্দোলালের দরবারে মুজরা করতে যায় না,—দক্ষিণে গান-বাজনার কে কি জানে?"

দূতের কথা শুনে দরবার শুদ্ধ লোক একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেল। বীণার তান আগেই থেমে গিয়েছিল। মুমূর্ষুর শেষ নিঃশ্বাসগুলোর মতন তারগুলো এক একবার ঝন্‌-ঝন্ করে উঠ্‌তে লাগল। আসরের মধ্যে একটা উঁচু তক্তের উপর চান্দোলাল মোটা মখ্‌মলের তাকিয়া হেলান দিয়ে জড়োয়া ফরাসীতে তামাক টান্‌ছিলেন,—টপ্ করে মুখে থেকে নলটা খসে তাঁর কোলের উপর লুটিয়ে পড়্‌ল।

সের খাঁর বেয়াদবি সেই আসরের অধিকাংশ লোককেই চঞ্চল করে তুল্‌লে; শুধু দিল্লীওয়ালারা মনে-মনে বল্‌তে লাগল, সের খাঁ সের-বাচ্ছার মতই জবাব দিয়েছে।

সেদিনকার সেই ভাঙ্গা আসর আর জম্‌ল না, আস্তে-আস্তে পা টিপে-টিপে যে যার বাড়ী চলে গেল। সেই নিস্তব্ধ, উজ্জ্বল ঘরে একলা বসে রইলেন চান্দোলাল। দূতের কথাগুলো যেন তখনো সেই বড় দরবার-ঘরের খিলানগুলোতে ঠেকে দ্বিগুণ জোরে তার কাণে এসে বাজতে লাগ্‌ল।

চান্দোলাল তাঁর লোকজনকে ডেকে বলে দিলেন, "ছলে, বলে অথবা কৌশলে জীবিত কিংবা মৃত সের খাঁকে হায়দ্রাবাদে আন্‌তেই হবে, যেমন করে পার তাকে নিয়ে এস।" যো হুকুম বলে আবার তারা দিল্লী ছুট্‌ল।

সে দিন বোধ হয় মাত্রাটা একটু বেশী হোয়ে গিয়েছিল। আফিংয়ের ঝোঁকে সের খাঁ স্বপ্ন দেখছিল, বেহেস্ত্‌ থেকে চার জন জিন্‌ তাকে নিয়ে যেতে এসেছে, সেখানকার দরবারে তাকে বাজাতে হবে। প্রথমটা তারা অনুনয় কর্‌তে লাগ্‌ল; সে বল্লে, সে কোথাও যেতে পার্‌বে না; ঘরে তার বিবি একলা থাকবে, সে হোতে পারে না। তারা বল্লে, ভালয়-ভালয় না গেলে তাকে জোর করে নিয়ে যাবে। এই বলে খাটিয়ার চার কোণে চারজন গিয়ে দাঁড়াল। সে তাড়াতাড়ি চারপায়া ছেড়ে নেমে পড়্‌বে, এমন সময়ে তাকে-শুদ্ধ তারা খাটিয়াখানা তুলে আকাশে উড়তে আরম্ভ করে দিলে।

চিলের মতন ঘুরে-ঘুরে তারা উপরে উঠ্‌তে লাগ্‌ল। ক্রমে পাখীদের রাজ্য, তার পর সাদা মেঘ, সোণালী মেঘের রাজত্বের ভেতর দিয়ে তারা উড়ে চলতে লাগ্‌ল। সের খাঁ একবার

নীচের দিকে চেয়ে দেখ্‌লে, সেখান থেকে তার বাড়ীটা একটা ছোট কাল দাগের মতন দেখা যাচ্ছে। ক্রমে সেটুকুও মিলিয়ে গেল। নিরুপায় সের একবার চারদিকটা ভাল করে দেখে নিয়ে, জিনদের জিজ্ঞাসা করলে—"আর কতটা যেতে হবে বাবা?" মাথার দিকের একটা জিন ধমক দিয়ে তাকে বল্লে—"এই, চুপ কর্‌,—বেশী গোল কর্‌লে এখুনি এইখান থেকে তোকে ছেড়ে দেবো,—একেবারে গুঁড়ো হয়ে যাবি।" সে আর কোন কথা না বলে, আল্লার নাম জপতে লাগ্‌ল।

সোণালী মেঘের রাজত্ব ছাড়িয়ে তারা আঁধারে মেঘের রাজত্বের ভেতর দিয়ে চল্‌তে লাগ্‌ল। ওঃ! সে কি ঘুট্‌ঘুটে অন্ধকার! কিছু দেখতে পাওয়া যায় না,—শুধু একটা শাঁ-শাঁ আওয়াজ তার কাণে আস্‌তে লাগ্‌ল। আঁধারে মেঘের সীমানা পেরিয়ে তারা চাঁদের রাজত্বে এসে পড়্‌ল। এইখানে দরবার হবার কথা;—জিনেরা এইখানে এসে তার খাটিয়াটা নামিয়ে দিলে।

দরবার তখন সবে আরম্ভ হয়েছে। একজন হুরী জর্দা ও ফিরোজা মেঘে বোনা একটা ওড়না উড়িয়ে তান ধরেছে,—এমন সময়ে জিনেরা তাকে নিয়ে এসে দরবারে হাজির করলে। একটা জিন সভাপতিকে নিবেদন করে বল্লে,—"হুজুর, লোকটা কিছুতেই আসতে চায় না,—তাই জোর করে ধরে নিয়ে এসেছি।" সভাপতি তার মালকোঁচা-মারা দাড়িতে একবার হাতটা বুলিয়ে, গম্ভীর ভাবে—"বেশ করেচো"—বলে' তাকে বাজাতে বল্লে।

চাঁদের দরবারের চক্‌মকানি দেখে, সের খাঁ বেচারী বাজাবে

কি, সে একেবারে হক্‌চকিয়ে গেল, ভাল করে সুর বাঁধতেই পারলে না। সবাই বল্‌তে লাগল—লোকটা কিছু জানে না। তার পর তার বাজনা শুনে ত তারা হেসেই অস্থির। রাজা বল্লে—"থাম না; ওকে ছেড়ে দিয়ে আয়, ও কিছু জানে না।" সের খাঁ তার যন্ত্রটা নিয়ে কোন রকমে আসর থেকে উঠে বাইরে এসে হাঁফ ছেড়ে বাঁচ্‌ল।

জিনেরা আবার তাকে খাটের উপর চড়িয়ে নামতে লাগল; তারপর যেখান থেকে তার বাড়ীটা ছোট্ট একটা কাল দাগের মত দেখা যাচ্ছিল, সেই জায়গাটাতে এসে তারা তাকে বল্লে,—"ঐ দেখ্‌ তোর বাড়ী দেখা যাচ্ছে। এইখান থেকে আমরা তোকে ছেড়ে দেবো, তুই একেবারে ঠিক তোর বাড়ীর ছাদের ওপর গিয়ে পড়্‌বি।" সের বেচারী এই প্রস্তাব শুনে ত ভয়ে চেঁচিয়ে উঠ্‌ল, কিন্তু তারা কোন রকম ওজর না শুনে, তাকে শূন্য থেকে ছেড়ে দিলে। শোঁ-শোঁ করে ঘুর্‌তে-ঘুর্‌তে খাটিয়াখানা মাটির ওপর দড়াম্‌ করে এসে পড়ল।

অত উঁচু থেকে পড়ে গিয়ে তার ঘুমটা চট্‌ করে ভেঙ্গে গেল। 'ইয়া আল্লা' বলে সে উঠে পড়ে যখন দেখলে যে, নিজের বিছানায় শুয়ে আছে, তখন একটা নিশ্চিন্দির হাঁফ ছেড়ে পাশ ফিরে শুল।

তখন প্রায় ভোর হয়ে এসেছে। পূর্ব্ব-গগনে সোণার আলো আজান দিয়ে জগতের লোকদের ডাক্‌ছিল, 'ওঠো—ওঠো, জাগরণের সময় হয়েছে।' সের খাঁ নেমাজ পড়বার জন্য

তাড়াতাড়ি বিছানা ছেড়ে উঠে দেখলে, বাড়ীর যেখানে সে শুয়েছিল, এ ত সে জায়গা নয়! এই গভীর জঙ্গলের ভিতর সে কি করে এসে পড়্‌ল? রাত্রের স্বপ্নের কথা মনে হতেই তার অন্তরাত্মা শিউরে উঠ্‌ল। সে ভাবছিল, তবে কি। এমন সময়ে একজন ভদ্রবেশী লোক এসে তাকে অভিবাদন করে অতি মোলায়েম ভাষায় বল্লে,—অনিচ্ছা সত্ত্বে তারা তাকে নিদ্রিত অবস্থায় তার বাড়ী থেকে তুলে নিয়ে এসেছে। মহারাজের হুকুম, তাকে হায়দ্রাবাদে যেতে হবে।

সের খাঁর চোখের সামনে তখন মুন্নার সেই অশ্রুসিক্ত মুখখানা ভাস্‌ছিল। নির্ব্বাক হয়ে সে আবার নিজের খাটিয়ার ওপর শুয়ে পড়্‌ল। সে দিন সকালে তার আর নেমাজ পড়া হোল না।

এম্‌নি করে কখনো হাতী, কখনো ঘোড়া, পাল্কী চড়ে প্রায় দু'মাস পরে তারা সের খাঁকে হায়দ্রাবাদে নিয়ে এল। সে বেচারীর মাথায় কিছুতেই ঢুকছিল না যে, কি করে ঘুমন্ত অবস্থায় একটা লোককে খাটিয়া সমেত বাড়ীর ভেতর থেকে এরা তুলে নিয়ে এল!

দেখ্‌তে দেখ্‌তে সহরময় রটে গেল, দিল্লী থেকে সের খাঁ এসেছে। হায়দ্রাবাদের ওস্তাদেরা দিল্লীওয়ালাদের না মানলেও, সের খাঁর বাজনা শোনবার জন্য তারা মনে-মনে উৎসুক হোয়ে ছিল।

একদিন চান্দোলাল ঠিক করলেন, আজ সের খাঁর বাজনা

হবে। দেশ-বিদেশে রটিয়ে দিলেন, যে-কোন লোক সে দিন তাঁর দরবারে এলে, সের খাঁর বাজনা শুন্‌তে পাবে। সের খাঁর নামে দলে-দলে লোক সে দিন আসরে এসে জম্‌তে লাগ্‌ল।

সের খাঁর বাজনা হবার আগে অন্য কয়েকজনের বাজনা হল। রাত্রি যখন প্রায় দশটা, তখন চান্দোলাল নিজের জায়গা থেকে সেরকে ডেকে বল্লেন,—"খাঁ সাহেব, এবার তুমি বাজাও।" সের মাথা নীচু কোরে—'যো হুকুম' বলে নিজের বাজনা সুরে মিলিয়ে বাজাতে সুরু কর্‌লে।

সের খাঁর বাজনা কিন্তু সে দিন একেবারেই জম্‌ল না। হায়দ্রাবাদের ওস্তাদেরা প্রথমে হাসি, শেষ টিট্‌কারি পর্য্যন্ত দিতে আরম্ভ করলেন। চান্দোলাল ভাবতে লাগলেন—এই সের খাঁ! এরি নাম সমস্ত ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়েছে! এত কষ্ট, এত অর্থব্যয় করে কি এই বাজনা শোনবার জন্য দিল্লী থেকে একে জোর করে নিয়ে এলুম! নিজের মূর্খতায় চান্দোলাল নিজেকেই ধিক্কার দিতে লাগিলেন।

চান্দোলাল হাত নেড়ে বাজনা বন্ধ কর্‌তে বল্লেন। সের খাঁ যন্ত্রটী তুলে নিয়ে আস্তে-আস্তে নিজের ঘরে চলে গেল।

দিল্লীর অপমানের যেটুকু বাকী ছিল, সে দিন সের খাঁর বাজনার পর সেটুকুও হোয়ে গেল। চান্দোলাল হেসে তাদের বল্লেন,—"এই তোমাদের সের খাঁ!" তারা আরজি কর্‌লে, হয় ত দেশ থেকে এসে খাঁ সাহেবের মন-মরজি খারাপ আছে, সেইজন্য বাজনা সে দিন জমেনি। হুজুর আর একদিন দয়া

করে হুকুম দিলে, হয় ত অন্য রকম হোতে পারে। চান্দোলাল ভাবলেন, হয় ত বা হোতেও পারে। প্রকাশ্যে বল্লেন—'আচ্ছা দেখা যাবে।'

সের খাঁ নিজের ঘরে একলা বসে ভাবছিল বাড়ীর কথা। সেখানে মুন্না একলা কি করছে! বিবাহের পর এই পঞ্চাশ বছর একদিনও সে চোখের আড়াল হয় নি। তাকে ছেড়ে আজ সে কেমন করে দিন কাটাচ্ছে! একটা ভাবনা সেরের বুকের ভেতর গুমরে-গুমরে উঠ্‌ছিল, কিছুতেই সেটার হাত থেকে নিজের মনকে ছাড়াতে পারছিল না। সে ভাবছিল, যদি আর তার সঙ্গে না দেখা হয়! ভাব্‌তে-ভাব্‌তে তার বুকের ভেতর কেঁপে উঠতে লাগ্‌ল। সের খাঁ ভাবতে লাগল, কেমন করে এখান থেকে পালান যায়। চারদিকে খাড়া-পাহারা, পালাতে গিয়ে ধরা পড়লে প্রাণ পর্য্যন্ত যাবার সম্ভাবনা। নানা রকম আকাশ-পাতাল ভাব্‌তে-ভাব্‌তে তার মাথা ঘুরতে লাগ্‌ল। এমন সময় প্রহরী এসে সংবাদ দিলে,—এখনি মহারাজের দরবারে বাজনা নিয়ে হাজির হোতে হবে। 'আচ্ছা' বলে যন্ত্র নিয়ে আবার সেদিনকার মত সে দরবারে গিয়ে বস্‌ল। সে দিন সের খাঁর মন বড় খারাপ ছিল। মুন্নার চিন্তা তার সমস্ত মনকে এমন করে ঢেকে রেখেছিল যে, অন্যদিকে কিছুতেই সে মন দিতে পার্‌ছিল না। আগেকার দিনে সে তবু একটু বাজাতে পেরেছিল;—এদিনে ত একবারে কিছুই বাজাতে পারলে না। মিনিট পাঁচেক বাজাতে-না-বাজাতেই

তার হাত কাঁপতে লাগ্‌ল। হায়দ্রাবাদী ওস্তাদের দল চেঁচিয়ে বলে উঠ্‌ল—"হুজুর, একটা পাঁচ বছরের ছেলেও এর চেয়ে ভাল বাজাতে পারে।" চান্দোলাল কিন্তু সেদিন তাদের ঠাট্টায় যোগ দিতে পারলেন না। তিনি ভাবছিলেন, নিশ্চয় এর মধ্যে একটা কিছু গোলমাল আছে, তা না হলে, যার এত নাম, সে কি এই রকম বাজায়! সভা ভেঙ্গে গেলে সকলেই উঠে চলে গেল; শুধু বসে রইল সের খাঁ আর চান্দোলাল। চান্দোলাল আস্তে-আস্তে নিজের জায়গা থেকে নেমে এসে, সের খাঁর পাশে বসে, তাকে ধীরে-ধীরে জিজ্ঞাসা কর্লেন,—"আচ্ছা, ভাই খাঁ সাহেব, এই কি তোমার বাজনা? এই বাজনায় তুমি সমস্ত ভারতবর্ষকে মুগ্ধ করে রেখেছো?" সের খাঁর মনে হচ্ছিল, এই অপমানটা সহ্য করবার জন্যই বুঝি আল্লা এতদিন তাকে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন। চান্দোলাল আবার বল্‌তে লাগ্‌লেন—"দিল্লীর সব চেয়ে বড় ওস্তাদ তুমি,—কিন্তু সেখানকার ছোট-ছোট ওস্তাদরা যে তোমার চেয়ে ঢের ভাল বাজাতে পারে।" সের খাঁ চোখ মুছে জবাব দিলে,—"হুজুর,আমি আপনার চাকর, হুকুম দিলেই আমাকে বাজাতে হবে। কিন্তু এই যে আমার সুর-বাহার,এ যন্ত্র দিল্লীর বাদশার নিজের হাতের। বাদশার যন্ত্র ত আপনার তাঁবেদার নয়। এর যে দিন মরজি হবে, সে দিন বাজাবে, আমি কিংবা আপনি শত চেষ্ট করলেও এ থেকে সে সুর বার কর্‌তে পারব না, যে সুরে সমস্ত ভারতবর্ষ মজেছে।"

চান্দোলাল ভাবলেন—তাই ত! একটু চুপ করে থেকে বল্লেন, "আচ্ছা, বল্‌তে পার, এ কবে বাজবে?"

সের খাঁ বল্লে—"তা ত বল্‌তে পারি না জনাব! তবে হুকুম করে দিন আপনার লোকদের যে, এ যখন বাজবে, তখন আপনি যে রকম অবস্থায় যেখানে থাকবেন, আমি যেন সেখানে যেতে পারি। যখনি এর মরজি হবে, আপনার কাছে ছুটে আস্‌ব।"

চান্দোলাল বল্লেন—"আচ্ছা, তাই হবে।" সেদিনকার মত সভা ভেঙ্গে গেল। চান্দোলাল বাড়ীর লোকজন, এমন কি, অন্দরের প্রহরীদের পর্য্যন্ত হুকুম দিয়ে দিলেন যে, সের খাঁ যখন তাঁর কাছে আস্‌তে চাইবে, তাকে যেন আস্‌তে দেওয়া হয়।

সে দিন সন্ধ্যেবেলা চান্দোলাল সবেমাত্র দরবারে এসে বসেছেন, দুই-একজন করে লোক আসতে আরম্ভ করেছে, এমন সময় শুনতে পেলেন যে, সের খাঁ পাগল হোয়ে গিয়েছে। লোক পাঠিয়ে খবর নিতে না-নিতে সের দরবারে এসে উপস্থিত হোল। আলুথালু বেশ, মাথার চুলগুলো রুক্ষ, ঠিক যেন পাগল! এক হাতে সুরবাহার, আর এক হাতে কুর্ণিশ করে সে সভায় বসেই চান্দোলালকে ডেকে বল্লে, "মহারাজ, আজ শুনুন; সুর-বাহারের মেজাজ আজ বড় ভাল।"

সুর-বাহারটীকে তুলে ধরে প্রথমে সে একটা ঝঙ্কার দিলে। দু'দিন যার বাজনা শুনে চান্দোলালের মনে হোয়েছিল, এ রকম বাজনা যে-সে বাজাতে পারে, আজ কিন্তু এই প্রথম্‌ ঝঙ্কারেই তিনি বুঝতে পারলেন, যার-তার হাতে এ রকম ঝঙ্কার ওঠে না।

বাতাস লাগলে ঝাড়ের বাতিগুলো যেমন চন্‌মন্‌ করে ওঠে, প্রথম ঝঙ্কারেই তাঁর প্রাণের ভেতরটা তেমনই চন্‌মনিয়ে উঠ্‌ল।

সের খাঁ মাটীর দিকে নীচু করে আস্তে-আস্তে একটা রাগিণী বাজাতে আরম্ভ করলে। প্রত্যেক মীড়ে সূক্ষ্ম শ্রুতি বেরিয়ে চান্দোলালের অন্তরে ধীরে-ধীরে গিয়ে আঘাত করতে লাগ্‌ল। তাঁর অন্তরটা বুঝতে পাচ্ছিল, এ রকম বাজনা তিনি জীবনে কখনো শোনেন নি। সের খাঁর বাজনা শুনে তাঁর বুকের ভেতরটা কেমন করতে লাগল। তাঁর মনে হোতে লাগ্‌ল, এ কি ভাষা, যা বুঝতে পারা যায় না, অথচ বুকের ভেতর যে রক্ত বয়ে যাচ্ছে, তার সঙ্গে এর পরিচয় আছে। এ যেন লক্ষ বৎসর পূর্ব্ব-জন্মের বিস্মৃত কোন একটা সুখ-স্বপ্নের কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চায়। বিস্মৃতির আবছায়াটা মুছে গিয়ে, সেটা একটু ফুটে ওঠবার আগেই, আবার সুরের জালে সমস্তটা ঢাকা পড়ে। কার যেন অতি ক্ষীণ স্বর কাণে আস্‌ছে, এ যেন কতদিনের পরিচিত; কোথায় শুনেছি, কবে,—আবার সব মিলিয়ে গিয়ে গম্‌গম্‌ করে তারের ঝন্‌ঝনায় সব ঢাকা পড়ে। প্রত্যেক মূর্চ্ছনায় মনে হোতে লাগ্‌ল, যেন দেওয়ালের বাতিগুলো পর্য্যন্ত মূর্চ্ছিত হোয়ে পড়্‌বে! প্রতি গমকে মনে হচ্ছিল, এখনি বুঝি সুর-বাহারের বুক ফেটে, ঝলকে-ঝলকে রক্ত বেরুবে।

চান্দোলাল নিজের অজ্ঞাতসারে কখন যে আসন ছেড়ে সেরখাঁর সামনে এসে বসেছেন, তাঁর মাথার তাজ কখন যে সেরের পায়ের ওপর লুটিয়ে পড়েছে, তা সভা-শুদ্ধ কারো

নজরে পড়ে নি। দরবারের আজ সকলেই তাঁরি মত মুগ্ধ।

বাজনা শুন্‌তে শুন্‌তে চান্দোলালের বুকের ভেতর একটা ব্যথা জাগতে লাগল। তিনি নিজেই বুঝতে পারছিলেন না, কিসের এ ব্যথা। চিরসুখী, রাজার দুলাল চান্দোলালের অগাধ আনন্দপূর্ণ প্রাণের তলায় এত যে ব্যথা কোথায় লুকিয়ে ছিল, তার খোঁজ তিনি জান্‌তেন না। অলক্ষ্যে তাঁর চোখ দিয়ে এক ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়্‌ল। তার পর আর এক ফোঁটা! চান্দো-লাল তাঁর রেশমী রুমালে চোখ ঢেকে, বাজনা শুন্‌তে লাগ্‌লেন।

তাঁর সেই ব্যথা, যেটা বুকের ভেতর গুমরে-গুমরে, চোখ ফেটে ঝরে পড়ছিল, ক্রমে সেটা বাড়তে-বাড়তে কান্নায় পরিণত হল, মহাবীর চান্দোলাল নিজেরই অজ্ঞাত বেদনায় ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন। শুধু যে চান্দোলালই কাঁদছিলেন, তা নয়; সভায় যত লোক উপস্থিত ছিল, সবারই চোখ ছলছল্‌ করছিল। তার পর কাঁদতে-কাঁদতে যখন চান্দোলালের প্রায় দমবন্ধ হোয়ে এসেছে, এমন সময় তিনি চোখ থেকে রুমাল নামিয়ে বল্লেন,—"বাস্‌, খাঁ সাহেব, খুব হোয়েছে, আর না। ধন্য তোমার সাধনা! ধন্য তুমি! আর তোমার বাজনা শুনে আজ আমিও ধন্য হলুম। এই নাও আমার গলার মালা, এই নাও আমার তাজ, আর এই সমস্ত লোকের সামনে আমি প্রতিজ্ঞা করছি, তুমি যা চাইবে আমি তাই দেবো।"

সের খাঁ মাথা নীচু করে বল্লে,—"হুজুরকে খুসী করতে পেরেছি, এই আমার যথেষ্ট পুরস্কার, আর কিছুই চাই না।"

চান্দোলাল উঠে সের খাঁকে আলিঙ্গন দিয়ে বল্লেন—"দাক্ষিণাত্যের সমস্ত ওস্তাদ আমায় যা দিতে পারে নি, তুমি আজ আমায় তাই দিয়েছ।"

দিল্লীর যে-সব ওস্তাদ এত দিন ধরে নির্য্যাতন সহ্য করে আস্‌ছিল, তারা সবাই মিলে চীৎকার করে উঠল,—"জয়, সের খাঁর জয়।"

সের খাঁ সেই বুড়া-বয়সের ভাঙ্গা-গলায় আর একবার গেয়ে উঠল—"জয়, মহম্মদ শার জয়।" সে দিন সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে-সঙ্গে দাক্ষিণাত্যে আবার আর্য্যাবর্ত্তের জয়-গান বেজে উঠল। সের খাঁ হাত জোড় করে চান্দোলালকে বল্লে—"মহারাজ, যদি সুখী হোয়ে থাকেন, তবে আমায় যেখান থেকে নিয়ে এসেছেন, আবার সেইখানে রেখে দিয়ে আসতে হুকুম করে দিন—আজকেই যেন রওনা হোতে পারি।"

* * * *

ছ-মাস পরে আবার এক দিন সন্ধ্যেবেলা চান্দোলালের লোকেরা দিল্লীর এক কোণে সের খাঁকে নামিয়ে বিদায় নিল। যে দিন তারা তাকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল, সে দিন আর আজকের দিনের কত প্রভেদ! অনেক দিন পরে আবার হিন্দুস্থান সের খাঁর যশোগান করতে আরম্ভ করেছে,

উদ্ধত দাক্ষিণাত্য মাথা নীচু করে তার গলায় জয়মাল্য পরিয়ে দিয়েছে।

দুপুরবেলাকার জ্বলন্ত সূর্য্য তখন ঠাণ্ডা হোয়ে, পশ্চিমের নীল সমুদ্রে আধখানা গা ডুবিয়ে, পৃথিবীর দিকে একবার শেষ চাওয়া চেয়ে নিচ্ছিল। ডুবন্ত সূর্য্যের দিকে চেয়ে-চেয়ে সের খাঁর মনে হোল, আমার যশোসূর্য্য এখনো অস্ত যায় নি। নবীন উৎসাহে তার বুকে আবার যুবকের বল ফিরে এসেছে। প্রশংসার নেশায় মাতাল সের খাঁ নিজের দরজায় এসে ঘা দিলে, "মুন্না— !"

দরজা খোলা ছিল। সে বাড়ীর ভেতরে গিয়ে ডাকলে, "মুন্না—মুন্না—"ছাদের ওপর থেকে কে যেন বিদ্রূপের সুরে তারি গলায় জবাব দিলে—মুন্না। এ-ঘর ও-ঘর করে অনেকক্ষণ ডাকা-ডাকির পর, একজন প্রতিবেশী এসে খবর দিলে, মুন্না নাই—সে নিরুদ্দেশ হবার সাতদিন পরে সে না খেয়ে শুকিয়ে মরে গেছে। মাথা ঘুরে সে সেইখানেই বসে পড়ল।

দিগ্বিজয়ী সের খাঁ ভাবতে লাগ্‌ল, যাকে জয় করবার জন্য তাকে কোন দিন কোন কষ্ট পেতে হয় নি, আপনি এসে যে ধরা দিয়েছিল, হঠাৎ দেবতার মতন নিষ্ঠুর হোয়ে সে কেন এমন করে চলে গেল!

দিনের আলো একটু করে কম্‌তে-কম্‌তে একেবারে নিভে এল, যেন কার মসীমাখা করস্পর্শে পৃথিবীটা হঠাৎ কালো হোয়ে গেল। আর সেই ঘন অন্ধকার ফুঁড়ে একটা করুণ সুর সের খাঁর কাণে এসে বাজতে লাগল—কোথায় তুমি! চোখের সামনে

একখানা সজল মুখ দু-একবার চক্‌মক্ করে আবার মিলিয়ে গেল। সের খাঁ উঠে দাঁড়াল, মাথায় চান্দোলালের দেওয়া যে জরীর পাগড়ীটা ছিল, সেটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে, সে ছুটে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। কোথায়? কার সন্ধানে?

মঙ্গল মঠ

আমাদের আড্ডার দেশজোড়া নামডাক ছিল। সেখানে যে এসে আধঘণ্টার জন্য বসেছে, তাকেই বলতে হয়েছে—হাঁ একটা আড্ডার মতন আড্ডা বটে! এক একটি লোকের হালচাল এক এক-রকমের, কোন দুটি লোকের স্বভাবে মিল পাবার যো ছিল না। তবে এক জায়গায় আমাদের সবারই মিল ছিল, আমরা সবাই ছিলুম লক্ষ্মীছাড়া। হাড়-লক্ষ্মীছাড়া না হলে সেখানে কেউ পাত্তা পেত না। লোকে এই আড্ডার নাম দিয়েছিল "লক্ষ্মীছাড়ার দল।"

ভৈরবচন্দ্র ছিলেন আমাদের মধ্যে সব থেকে বাবু। শান্তিপুরে ধুতি, রেশমের ফতুয়া, ঢাকাই আদ্দির পাঞ্জাবী, ভাল বার্ণিশের লপেটা এ সব ছাড়া সে এক-পা-ও নড়ত না। তার এই সব বিলাসিতার বিরুদ্ধে আমাদের বল্‌বার কিছু ছিল না, তবে তার মাথার সেই শাঁস বার করা থাক্‌-কাটা চুল ছাঁটা দেখলেই আমাদের মেজাজ যেতো চটে। ভৈরবকে এই চুল ছাঁটা সম্বন্ধে কিছু বল্‌তে গেলেই সে বল্‌ত—লোকের স্বাধীন ইচ্ছার বিরুদ্ধে দাঁড়ান তোমাদের কেমন একটা বদ অভ্যেস—

বিলাস কুমার ছিল ভৈরবের ঠিক উল্টো। 'সে পরত গেরুয়া বসন, মুক্ত কচ্ছ, নেড়া মাথা, খালি পা—বিলাস দিন

কতক সন্ন্যাসীও হয়েছিল, সম্প্রতি জঙ্গল ছেড়ে আবার সে সহরবাসী হয়েছে। হঠাৎ তার এই মত পরিবর্ত্তনের কারণটা আমাদের কাছে ব্যক্ত করেনি।

বাইরে এদের যেমন পার্থক্য ছিল তেমনি অন্তরেও তারা দুই বিভিন্ন ভাবের রাজ্যে বিচরণ করত। ভৈরবের মুখে ছিল দিনরাত বেদান্তের ছড়াছড়ি। শান্তিপুরে ধুতির কোঁচান কোঁচাটী বাঁ হাতে আলগোছে ধরে যখন সে বেদান্তের ব্যাখ্যা করত তখন সেটা শোনবার না হোক্ একটা দেখবার জিনিষ হত বটে। আবার ওদিকে গেরুয়া বসন পরা বিলাস যখন নেড়া মাথা দুলিয়ে চার্ব্বাক দর্শনের সরল অর্থ ও ভাষ্য জুড়্‌ত তখন আমাদের আড্ডাধারী অতুল চার্ব্বাকের একজন উঁচুদরের শিষ্য হলেও চঞ্চল হয়ে বলে উঠত—বিলাস দা একটু সাম্‌লে—

মহেন্দ্রের বয়স ছিল প্রায় সত্তর। আমরা সবাই তাকে দাদা বলে ডাক্‌তুম। ভৈরব ও বিলাসের অন্তর বাইরের এই তারতম্য নিয়ে যখন আমাদের মধ্যে কথাবার্ত্তা হত, মহেন্দ্র দা তখন বল্‌ত—কি জানিস্! ওরা মাঝে মাঝে পাষাণ ভেঙ্গে দাঁড়িপাল্লাটাকে ঠিক করে নেয়—

এত রকমের লোক থাকা সত্বেও রোজই একসঙ্গে মেলা-মেশার জন্য আড্ডা মধ্যে মধ্যে বৈচিত্র্যহীন হয়ে পড়ত, সেই সময় আমরা যে-যার এক একদিকে চলে যেতুম, দিনকয়েক আড্ডাঘরের দরজায় চাবি পড়্‌ত।

ঠিক্ এমনি একটা সময়ে যখন সবারই মনে পালাই পালাই

ডাক দিতে আরম্ভ করেছে সেই সময় একদিন ভৈরবচন্দ্র নতুন বেশে আড্ডায় এসে হাজির হলেন। আমরা ত তার চেহারা দেখে একেবারে অবাক! তার মাথায় সেই একআনা পনেরো আনা চুল কি করে চৌরস হয়ে কদম-ছাঁটে পরিণত হয়েছে। গায়ে ফিনফিনে আদ্ধির পাঞ্জাবীর বদলে একটা মোটা কুর্ত্তা, আর তার উপরে একখানা বোম্বাই বিছানার চাদর, পরনে একখানা মোটা থান ধুতি, পায়ে সাদা বেলোয়ারী চামড়ার একজোড়া চটি আর তার হাতে শঙ্কর দর্শনের এক খণ্ড।

ভৈরব বল্লে—ব্যস, সংসারের সঙ্গে তার ইতি হয়ে গেল। সে শীগ্‌গীরই হিমালয়ের মঙ্গল মঠের সেবক হয়ে সেখানে চলে যাচ্ছে। মঙ্গল মঠের প্রতিষ্ঠাতা একজন ঘোরতর অদ্বৈতবাদী ছিলেন। তার মনের মধ্যে এখন এই দ্বৈতাদ্বৈতের ভয়ানক লড়াই চলেছে, সেই সন্দেহটা কেটে গেলেই একদিন সে বেরিয়ে পড়বে।

ভৈরবের মুখে এইসব লম্বা চওড়া কথা ইতিপূর্ব্বে আমরা অনেক শুনেছি কিন্তু তেমন মনোযোগ কখনো দিইনি। আমরা জানতুম দুনিয়াশুদ্ধ লোক মিথ্যাবাদী আর আমরা সত্যবাদী। ও-সব দ্বৈতবাদী, অদ্বৈতবাদী মায়াবাদীর ধার কখনো ধারতুম না। মহেন্দ্র দাদা বলত ও-গুলো মিথ্যেবাদীদেরই নামান্তর মাত্র।

আমাদের এই অবহেলায় ভৈরবচন্দ্র কিছুমাত্র বিচলিত না হয়ে দিনে দিনে আরও উৎসাহিত হয়ে উঠছে দেখে আমরা

তাকে ভণ্ড বলে ডাকৃতে আরম্ভ করে দিলুম। প্রথমে দিনকয়েক সে এই ডাকে কিছুমাত্র আপত্তি জানায় নি, তারপর হঠাৎ একদিন ঘোরতর আপত্তি জানিয়ে বল্লে—আড্ডায় আসা তা'হলে ত্যাগ কর্তে হল—

ভৈরবের আপত্তির মূলে একটু ইতিহাস ছিল। একদিন আমরা তাকে ভণ্ড বলা মাত্র নফর তার প্রতিবাদ করে বল্লে—কেন তোমরা ওকে ভণ্ড বল ?

নফরটা ছিল কিন্তু ভণ্ড চূড়ামণি। তার মন ভাবত এক কথা, আর মুখ বল্‌ত আর এক কথা। তার এই অসাধারণ গুণের জন্য আড্ডা থেকে সর্ব্ববাদীসম্মতিক্রমে তাকে উপাধি দেওয়া হয়েছিল—অন্তঃসলিলা। সে এইরকম করে একজনের পক্ষ নিয়ে তাকে গরম করে দিত, তারপর তর্ক অর্থাৎ ঝগড়াটি যখন বেশ পাকিয়ে উঠত তখন নিশ্চিন্ত মনে অন্য লোকের সঙ্গে গল্প জুড়ত।

নফরের কথা শুনে আমাদের সত্যিই মনে হয়েছিল—তাইত ভৈরবকে ভণ্ড বলাটা বোধ হয় উচিত হচ্ছে না। তাই তাকে একটু আপ্যায়িত কর্‌বার জন্যে আমরা বল্লুম—ভয় নেই ভৈরব, ও ভণ্ড সাজতে সাজতে সাধু হয়ে যায়—

নফর বল্লে—কখনই না—

নফরের কথা শুনে ভৈরব আরও উৎসাহিত হয়ে উঠল। সে বল্লে—অসত্য যার ভিত্তি তার উপরে কখনো কোন ভাল কাজ হতে পারে না—

তর্কটি জমিয়ে দিয়ে নফর চন্দ্র সরে পড়্লেন। ভৈরব তখন সংস্কৃত, বাংলা, হিন্দী, ইংরেজী বয়েৎ ছেড়ে তার কথার সত্যতা প্রমাণ করবার চেষ্টা কর্তে লাগল। বিলাস একমনে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে আফিংয়ের নেশায় ঢুলছিল। থেকে থেকে তার মাথাটা কোলের ওপর লুটিয়ে পড়ছে—এই রকম অবস্থা। হঠাৎ ভৈরবের একটা হুঙ্কারে সে চমকে উঠে বল্লে—ব্যাপার কি! ভৈরব এত চেঁচাচ্ছ কেন হে?

ভৈরবের মুখে তর্কের কারণ শুনে বিলাস বল্লে—আচ্ছা আমাদের পক্ষে যদি আমরা প্রমাণ খাড়া করতে পারি?

ভৈরব বল্লে—তা হলে অন্ততঃ তর্কে হেরে গেলুম এটা স্বীকার করব।

বিলাস বল্লে—তবে শোন—

আমরা বিলাসকে ঘিরে গোল হয়ে বসলুম। অতুল মনে করলে বিলাস হয়ত চার্ব্বাক দর্শনের কোন একটা অপ্রকাশিত অধ্যায়ের ব্যাখ্যা সুরু করবে, তাই সে একটু ভয়ে ভয়ে বল্লে—বিলাস দা একটু আস্তে ভাই, বাড়ীর ভেতরে যেন শুনতে না পায়—

বিলাস বল্তে লাগল—তোমরা সবাই জান যে জপেন আমার সহোদর, কিন্তু তা নয়। আমি বাপের একছেলে, জপেনও বাপের একছেলে, আমরা দুজনে মাসতুত ভাই। আমার মাতামহ গোষ্ঠি খুব ধনী ছিলেন। আমি যে আজ চার্ব্বাক দর্শনে এত বড় একজন পণ্ডিত হয়ে উঠেছি—এই

পাণ্ডিত্য বংশ পরম্পরায় আমি আমার মাতামহের দিক থেকে পেয়েছি। তবে তাঁরা চারু বাক্যগুলির সঙ্গে চারুকার্য্যগুলিকেও বেশ সুচারুরূপে সম্পন্ন করতেন। বাক্য ও কার্য্য বিজ্ঞানের প্রথম এবং সর্ব্বপ্রধান স্বতঃসিদ্ধ হচ্ছে, ঐ-দুটো জিনিষের মিলন যেখানে সেইখানেই অনর্থপাত। এক্ষেত্রেও সে নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নি। মাতামহের পূর্ব্বপুরুষেরা এই বাক্য গুলিকে কার্য্যে পরিণত করে করে তাঁদের বিশাল বিষয়ের বোঝাটি যখন আমার মাতামহের পিঠের ওপর চাপিয়ে দিয়ে সরে পড়লেন তখন দেখা গেল যে, বিষয়ের খোলসটি ঠিক আছে বটে কিন্তু তার ভেতরটায় ঘুণ ধরে গেছে।

মাতামহের পুত্র সন্তান ছিল না। গরীবের ঘরে দুই মেয়ের বিয়ে দিয়ে জামাইদের তিনি নিজের বাড়ীতে এনে রেখে-ছিলেন। জামাইরা গরীবের ছেলে, বড়লোক শ্বশুর বাড়ীতে এসে দু-দিনেই তাঁদের বনিয়াদি চাল চলন আয়ত্ত করে ফেল্লেন। আয়ত্ত করলেন বটে কিন্তু গরীবের হাড়ে তাঁদের সেটা আর সহ্য হল না। কাজেই আমাকে আর জপেনদাকে জ্ঞান হবার আগেই পিতৃহীন হতে হয়েছিল। আমাদের মাতামহ মারা যাবার আগেই মার আর মাসীমার মৃত্যু হয়েছিল তাই দাদা-মশায়ের মৃত্যুদিনেই পাওনাদারদের হাতে বাড়ীখানা ছেড়ে আসবার সময় নিজের ভাবনা ছাড়া আর কারো ভাবনা ভাবতে হয় নি!

আগেই বলেছি, পিত্রালয় কখনো দেখিনি, দাদামশায়ের

বাড়ীকেই নিজের বাড়ী বলে জানতুম। তার প্রত্যেক থাম, এমন-কি প্রত্যেক ইঁটখানার সঙ্গে আমাদের দুই ভাইয়ের এমন পরিচয় ছিল যে, কেউ যদি আমাদের চোখ বেঁধে দিয়ে বাড়ীর মধ্যে নিয়ে যেত ত আমরা দেওয়াল স্পর্শ করে বলে দিতে পারতুম—এটা ঠাকুর দালান, এটা দাদামশায়ের বসবার ঘর—

ছেলেবেলার এই খেলাঘর যেদিন ছাড়তে হল সেদিন আমি চোখের জল ধরে রাখতে পারিনি। আমার চোখে জল দেখে জপেন দা সেদিন বলেছিল—চলে আয় বিলে কাঁদিস নি, আমি বেঁচে থাকলে তোকে পঞ্চাশখানা বাড়ি বানিয়ে দেব।

সেই দিন থেকে কিন্তু জপেনদার সঙ্গে আমার ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল। আমার বাবার দুই সহোদর ছিলেন, তাঁরা আমায় নিয়ে গেলেন। জপেনদার পিতৃপুরুষের কেউ ছিল না, তাকে নিতেও কেউ এল না। সেই বয়সে সে যে কোথায় গেল, কার কাছে আশ্রয় নিলে তা জানি না!

এই ব্যাপারের দশ বারো বছর পরের কথা বলছি—আমি তখন লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে কোন একটা সওদাগরি আপিসে পঁচিশ টাকা মাইনের কেরাণীগিরি করি। একদিন গড়ের মাঠে কিসের একটা মেলা দেখতে গিয়ে জপেন দাদার সঙ্গে দেখা—তাকে দেখে ত আমি চিনতেই পারিনি! তার দুই হাতে গোটাদশেক হীরের আংটি, ঘড়ির চেন, সোনা বাঁধান ছড়ি—

দাদা জিজ্ঞেস কল্লে—বিলে কি কচ্ছিস? পঁচিশ টাকা মাইনের চাকরী করি শুনে সে বল্লে—দূর্ দূর্ চাকরী ছেড়ে দিয়ে আমার সঙ্গে বেরুতে আরম্ভ কর। বিশ্বাস করতে পারি এমন একটা লোক পাইনে, বড় মুস্কিলেই পড়েছি—

মেলায় একটুখানি ঘুরে তার গাড়ীতে গিয়ে উঠলুম। প্রকাণ্ড কালো জুড়ি। গাড়ীর পা-দানিতে পা দেওয়া মাত্র ভেতরে বিজলী বাতি জ্বলে উঠল। আমার ত দেখে শুনে তাক্ লেগে যাবার উপক্রম হল।

একটুখানি পরে গাড়ীখানা একটা প্রকাণ্ড ফটক পার হয়ে এক বাড়ীর মধ্যে ঢুক্‌ল। প্রাসাদের মত বাড়ী, যেমন বাড়ী তেমনি তার আসবাব-পত্র। জপেনদা বল্লে কোন এক ইংরেজের সাজান বাড়ী সে কিনেছে, দাম কত—পঁচিশ না পঞ্চাশ লাখ কত বল্লে ঠিক মনে নেই। দাদার সঙ্গে অনেক কথা হল। সে দালালীতে বিস্তর পয়সা রোজগার করে, তবে তার একজন সহকারী না হলে আর চলচে না। বিশ্বাস করে কার হাতেই বা কাজের ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়, মাসতুত ভাই হলেও আমি তার সহোদরেরই মতন ইত্যাদি—

নানা কথাবার্ত্তার পর সে বল্লে—কি খুড়োদের ওখানে পড়ে আছিস, আমার এখানে চলে আয়, দুই ভাইয়ে মিলে আবার আগেকার মতন থাকা যাবে।

পরদিন খুড়োদের সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়ে দাদার বাড়ীতে চলে এলুম। দুই-এক দিনের মধ্যেই তার সঙ্গে মোটর গাড়ী

করে কাজে বেরুতে আরম্ভ করা গেল। দাদা দুহাতে পয়সা রোজগার করত, আমাকে পেয়ে তার রোজগার আরও বেড়ে গেল। দুই ভাইয়ে মিলে আফিস খোলা হল। দালালীটা ছিল আমাদের প্রধান ব্যবসা, তবে তার সঙ্গে জাল জুচ্চুরি, বাটপাড়ি, জুয়া, ঘোড়দৌড় ইত্যাদি অনেক রকমে পয়সা উপায় হতে লাগল। দাদা বলত—দুনিয়াময় পয়সা ছাড়ান রয়েছে শুধু কুড়িয়ে নিতে জানতে হয়।

বছর দুয়েকের মধ্যে ধনী বলে আমাদের নাম জাহির হয়ে গেল। ব্যবসা অর্থাৎ জুচ্চুরিতে আমরা যে অদ্বিতীয় সে কথা সহরের আপামর সবাই জেনে গেল।

পয়সা যে কি রকম আমদানী হতে লাগল তা বল্লে তোমরা বিশ্বাসই করবে না। এক একদিন আমরা লাখ টাকা পর্য্যন্ত রোজগার করেছি। যেমন আমদানী প্রত্যহ তেমনি অজস্র পয়সা খরচও করতুম। রোজ রাত্রে আমাদের বাড়ীখানা যেন ইন্দ্রপুরী হয়ে থাকত। শ্যাম্পেনের ফোয়ারা, বাইজীর নাচগান আর বন্ধু-বান্ধবদের হাল্লায় সেই প্রাসাদের মতন বাড়ী খানা একেবারে জমজম করত। কোথায় কোন দেশে এক বাইজী ভাল নাচতে পারে, কোন রাজার কাছে একজন ভাল গাইয়ে আছে এই সব খবর জুটিয়ে আনবার জন্যে আমাদের মাইনে করা মোসাহেব ছিল, তারা সব খবর আনত আর যত টাকা লাগে তাই দিয়ে তাদের নিয়ে আসা হত। নবাব সিরাজউদ্দৌলা লক্ষ টাকা মুজরা দিয়ে দিল্লী থেকে ফৈজী বিবিকে আনিয়ে ছিল

শুনে তোমাদের তাক্ লেগে যায়, আর আমাদের ইতিহাস যখন লেখা হবে তখন দেখো লক্ষ টাকা মুজরা দিয়ে ও-রকম দশটা বাইজী আমরা আনিয়েছি। আজকে আমার এই সিরীষ-কাগজের মতন মোলায়েম গায়ের চামড়া দেখে তোমরা সব ঠাট্টা কর, একদিন দুধ আর গোলাপ জল দিয়ে এই চামড়া পরিষ্কার করা হত, আর এর পালিশ ঠিক রাখবার জন্য কত রকমের যে মলম লাগানো হত তার নাম করতে গেলে এখন একটা বড় অভিধান হয়ে যাবে।

ব্যবসা যত জোর চলতে লাগল জাল জুচ্চুরিতেও ততই পাকা হতে লাগলুম। মাসতুত ভাইয়ের সম্বন্ধ নিয়ে যে একটা বচন প্রচলিত আছে লোকে আমাদের দুই ভাইকে দেখিয়ে সেই বচনের সত্যতা প্রমাণ করত।

একবার দাদার একটা চালের ভুলে আমাদের ভয়ানক লোকসান হয়ে গেল। এই ব্যাপারে ব্যাঙ্কে যা-কিছু নগদ ছিল তা, আর বাড়ীখানা চলে গেল। টাকা যেমন জলের মতন আসত তেমনি জলের মতন বেরিয়ে গেল। লোকসান সামলে একটু দাঁড়াতে না দাঁড়াতে আবার লোকসান খেলুম। লোকসানের সময় লোকের মাথার ঠিক থাকে না, বুড়ো-ঘাগী ব্যবসাদারেরাই ডিগবাজী খায় ত আমরা—আমাদের দুজনের কারোই তখন ত্রিশ পার হয়নি।

জাল, জুচ্চুরি, বাটপাড়ি ইত্যাদিতে কোন দিক দিয়ে সামলাতে না পেরে একদিন আমরা দুজনে পাওনাদারদের

ফাঁকি দিয়ে সরে পড়লুম। দাদার এক মাড়োয়ারী বন্ধু বড়-বাজারে থাকত, তার বাড়ীতে মাস কয়েক গা-ঢাকা দিয়ে বসে থেকে একদিন সন্ধ্যে বেলা দুজনে বেরিয়ে পড়া গেল। পালিয়ে কোথায় যাওয়া হবে সেটা দাদা আগেই ঠিক করে রেখেছিল, আমি জিজ্ঞেস করাতে সে একটা ধমক দিয়ে বল্লে—কিছু জানতে চাস্‌নে এখন, সোজা চলে আয়—

দুজনে সন্ন্যাসীর ভেক নিয়ে গোরক্ষপুরের দুখানা টিকিট কিনে রেলে উঠে বসলুম। দিন দুই পরে এক সন্ধ্যেবেলা গোরক্ষপুরে নেমে এক ধর্ম্মশালায় রাতটা কাটিয়ে পরদিন সকাল থেকে আমরা হাঁটতে আরম্ভ করলুম। দাদার হালচাল দেখে মনে হল তার এ-সব রাস্তা যেন বেশ চেনা আছে। খানিকক্ষণ হাঁটার পর আমি আবার তাকে প্রশ্ন করায় সে বল্লে—আমাদের প্রায় সাতদিন হাঁটতে হবে। হিমালয় পাহাড়ে স্বামী সচ্চিদানন্দ নামে এক সন্ন্যাসী আছেন, আমরা গিয়ে তাঁর শিষ্য হব, সেইখানেই থাকব। ভাবলুম—এ মন্দ হলনা, অনেক পাপ করা গেছে, এবার সন্ন্যাসীই হওয়া যাক্—

কয়েকদিন অনবরত হেঁটে আমরা সচ্চিদানন্দ স্বামীর মঠে গিয়ে পৌঁছলুম। চারিদিকে ছোট বড় পাহাড় সব আকাশ ফুঁড়ে উঠেছে, তারই মাঝখানের উপত্যকায় ছোট্ট খানকয়েক বাড়ী—সন্ন্যাসীদের থাকবার মতন জায়গা বটে।

দাদা ত গিয়েই আর কোন কথাবার্ত্তা না বলে সচ্চিদানন্দের

পা-দুটো জড়িয়ে ধরে বল্লে—প্রভু আমরা মহাপাপী আমাদের কি উদ্ধার হবে না—

স্বামীজি তখন কি একটা বই পড়ছিলেন, দাদা ও-রকম হাঁউমাউ করে গিয়ে পায়ের ওপর পড়াতে তিনি চমকে দশহাত পেছিয়ে গেলেন। তারপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমাদের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে একটু হেসে বল্লেন—বৎস, তোমাদের কিছু ভয় নেই, অনুতাপে পাপের ময়লা কেটে যায়, তোমাদের অনুতাপ এসেছে, কিছু ভয় নেই—

সন্ন্যাসী সচ্চিদানন্দ অদ্ভুত লোক ছিলেন। যেমন তাঁর গৌরবর্ণ সুবিশাল দেহ, তেমনি তাঁর কণ্ঠস্বর। তাঁর কণ্ঠস্বরে এমন একটা মোহিনী শক্তি ছিল যে একবার শুনলেই মোহিত হয়ে যেতে হত। কি তাঁর গভীর জ্ঞান, অথচ শিশুর মতন সরল। বক্তৃতা করবার তাঁর যে অদ্ভুত ক্ষমতা দেখেছি আজ পর্য্যন্ত তা কারো দেখিনি।

মঠে আমরা পাঁচ সাত জন সেবক ছিলুম। সকাল বেলা ঘণ্টাকয়েক শাস্ত্রপাঠ হত তারপর আর কোন কাজ ছিল না, আমরা যে-যার পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে বেড়াতুম।

আমাদের মঠ থেকে দূরে একটা পাহাড় দেখা যেত তার মাথায় সব সময়েই বরফ জমে থাকত। পাহাড়ীরা এই পাহাড়টার নাম দিয়েছিল সতী। এই সতী নানা ছলে আমাকে এই পাহাড়ের বুকে আঁকড়ে রাখবার চেষ্টা করত। তার দিকে যখনই তাকিয়েছি তখনই দেখেছি, সে নতুন

সাজে সেজে রয়েছে। সকালে সূর্য্য ওঠবার আগেই তার চুড়োটা সলজ্জ নববধূর মুখের মতন গোলাপী রংয়ে রঙিন হয়ে উঠত। আমার মনে হত মহেশ্বরের প্রথম প্রণয় সম্ভাষণে নববধূ সতী যেন লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠেছে। কোন কোন দিন দুপুর বেলা সূর্য্যের লাল রশ্মি পড়ে পাহাড়টা এত লাল হয়ে উঠত যে, তার দিকে চাওয়া যেত না। সে সময়ে তার চেহারা দেখে মনে হত যেন দক্ষের দরবারে সতী দেবী পতি নিন্দা শুনে ক্রোধে লাল হয়ে উঠেছে এখুনি তার ব্রহ্মরন্ধ্র ফেটে প্রাণটা বেরিয়ে যাবে, আর তার তরল আগুন চারিদিকে ছিটিয়ে পড়ে পৃথিবীতে প্রলয় কাণ্ড সুরু হবে। অমাবস্যার অন্ধকারে যখন পৃথিবীর আর কিছুই দেখা যেত না তখনও তার দিকে চেয়ে দেখেছি, মনে হয়েছে, সতী যেন একটা গাঢ় নীল রংয়ের ওড়নায় সর্ব্বাঙ্গ ঢেকে কার সন্ধানে বেরিয়ে পড়েছে, ওড়ানা ভেদ করে ধবধবে সাদা রং ফুটে বেরিয়েছে। ক্রমে এই মঠ আর দূরের ওই সতী আমার সমস্ত মন প্রাণ গ্রাস করে ফেলতে লাগল। আমার অতীত যেন আমার মন থেকে মুছে যেতে আরম্ভ করল। কয়েকদিন আগেই আমি যে একটা মস্ত শয়তান, মস্ত জোচ্চোর ছিলুম সে কথা আমি নিজেই ভুলে যেতে লাগলুম। সময়ে সময়ে আমার মনে হত যে, আমি যেন চিরকাল এই পাহাড়ের কোলেই বেড়ে উঠেছি, আমার চারিদিকে এই যে ছোট বড় সব পাহাড় ওরা আমারই আত্মীয়। আমারই মতন একদিন তারাও এই বুকে খেলে

বেড়াত হঠাৎ কোন যাদুকরের মায়াদণ্ডের স্পর্শে তারা এই রকম নিশ্চল অসাড় হয়ে পড়েছে, আবার কবে কে এসে সোনার কাঠি ছুঁইয়ে তাদের জাগিয়ে দেবে সেই আশায় তারা দিন গুণছে।

দাদার কিন্তু সেখানে গিয়েও কোন পরিবর্ত্তন হল না। সে রোজ সন্ধ্যে বেলা আমাকে দিয়ে আফিং আনিয়ে খেত। পাহাড়ীদের ঘরে গিয়ে তাদের সঙ্গে রকম বে-রকমের নেশা করত। তা ছাড়া আমি তার সঙ্গে মাঝে মাঝে দুই একটা পাহাড়ী মেয়েকেও দেখেছি। অবশ্য সচ্চিদানন্দ কিংবা তাঁর কোন শিষ্য ঘুণাক্ষরে এ-বিষয়ে জানতে পারত না। বরং সে দিন-কয়েকের মধ্যেই স্বামীজির প্রধান শিষ্য হয়ে দাঁড়াল।

সচ্চিদানন্দের নিয়ম ছিল যে পাঁচ বছর অন্তর তাঁর প্রত্যেক শিষ্যকে তাঁর কাছে জীবনের পাপ স্বীকার করতে হবে। আমরা সেখানে থাকবার কিছুদিন পরে সেই পাপ স্বীকারের দিন এগিয়ে এল। সেদিন মঠে নিজেদের মধ্যেই একটা উৎসব করা হত। পাপ স্বীকারের ব্যবস্থা শুনে আমি ত চঞ্চল হয়ে উঠলুম, দাদা কিন্তু নির্ব্বিকার। দেখলুম সে আফিংয়ের মাত্রাটা একটু বাড়িয়ে দিলে মাত্র।

স্বীকার-উৎসবের দিন দুই আগে দাদা আমাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে বল্লে—আমায় একটু ধুনো জোগাড় করে দিতে পারিস্?

আমার কাছে মঠের ভাঁড়ার থাকত, হঠাৎ এত জিনিষ

থাকতে তার ধুনোর কি দরকার পড়ল তাই তাকে জিজ্ঞেস করলুম—ধূনো দিয়ে কি হবে ?

—দে তো খানিকটা ধূনো, একটা ওষুধ তৈরি করতে হবে। ভাঁড়ার থেকে খানিকটা ধূনো তাকে দিয়ে তক্কে-তক্কে ফিরতে লাগলুম। দেখলুম যে, দাদা নিজের ঘরে গিয়ে ধুনোটাকে গুঁড়িয়ে তিন চারটে গুলি পাকিয়ে টপ্ টপ্ করে গিলে ফেল্লে।

পরদিনই দাদা অসুস্থ হয়ে পড়ল। তার দুদিন পরে মঠের উৎসব। উৎসবের দিন দাদার অবস্থা রীতিমত খারাপ হয়ে দাঁড়াল। তার অসুখের জন্য আমায় তার কাছে থাকতে হল বলে পাপ স্বীকারের হাত থেকে মুক্তি পেয়ে গেলুম। সন্ধ্যের একটু পরে দাদার অবস্থা শোচনীয় হয়ে দাঁড়াল। ক্রমে তার চোখ দুটো লাল হয়ে কোটর থেকে ঠেলে বেরিয়ে আসতে আরম্ভ করলে। অবস্থা দেখে আমার মনে হতে লাগল যে, এখুনি তার প্রাণ বেরিয়ে যাবে।

দাদা আমায় বল্লে—স্বামীজিকে একবার ডাক। তাঁর কাছে পাপ স্বীকার না করলে আমি শান্তিতে মরতে পারব না। দাদা পাপ স্বীকার করলে আমার অবস্থাটাও বিশেষ সুবিধের হবে না ভেবে তাকে বল্লুম—দাদা এ সময় আর কেন—

সে বোধ হয় আমার মনের কথাটা বুঝতে পেরে বল্লে—তোর কিছু ভয় নেই, তুই স্বামীজিকে ডেকে নিয়ে আয়।

স্বামীজিকে ডেকে আনলুম। তিনি কাছে এসে দাদার

অবস্থা দেখে শিউরে উঠলেন। দেখলুম তার কষ্ট দেখে তাঁর চোখ জলে ভরে উঠল। কাতরস্বরে দাদাকে ডেকে তিনি জিজ্ঞেস করলেন—জপেন বড় কষ্ট হচ্ছে বাবা ?

দাদা হাঁপাতে হাঁপাতে বলতে লাগল,—প্রভু, দেবতা, আমার বোধ হয় সময় হয়ে এসেছে, কিন্তু যাবার আগে আমি যে পাপ করেছি তা আপনার কাছে স্বীকার করে না গেলে আমি মরেও সুখ পাব না—

সচ্চিদানন্দ বল্লেন ; তাঁর সেইগুলো মনে পড়লে আজও আমার শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে। তিনি বল্লেন—তীর্থযাত্রার আগে আর উপদেবতাকে প্রণাম কেন বাবা—পাপ স্বীকার করার উদ্দেশ্য, চোখের সামনে নিজের কীর্ত্তির একখানা জ্বলন্ত ছবি রেখে দেওয়া—ভবিষ্যতে জীবনযাত্রার পথে ঠিক হয়ে চলবার একটা উপায় মাত্র। তোমার আত্মা এখন অনন্তের পথে পাখা বিস্তার করেছে, দেহীর নিক্তির ওজনের পাপ-পুণ্যের বিচারে সেখানকার কোন লাভ নেই। তুমি নিশ্চিন্ত হও।

সচ্চিদানন্দের এই সব কথা শুনেও দাদা পাপ স্বীকার করবার জন্য জেদাজেদি করতে লাগল। তার সেই কাণ্ড দেখে আমার তখন ইচ্ছে হচ্ছিল—দিই গলাটা টিপে, পাপ স্বীকারের মজাটা একবার বার করে দিই।

দাদার জেদ দেখে স্বামিজী তাকে প্রশ্ন করলেন—নিজের পত্নী ছাড়া কখন অন্য কোন স্ত্রীলোকের—

সচ্চিদানন্দের কথা থামিয়ে দিয়ে দাদা বল্লে—প্রভু আমি

অবিবাহিত, তা ছাড়া মাতৃগর্ভ হতে ভূমিষ্ঠ হবার পর শিশু সে বিষয়ে যেমন নির্দ্দোষ থাকে ঐ বিষয়ে আমিও সেই রকম নিষ্কলঙ্ক।

দাদার কথা শুনে ত আমার মাথাটা লাট্টুর মত ঘুরতে লাগল। ওঃ কী ভয়ানক! জীবন-মৃত্যুর সন্ধিস্থলে দাঁড়িয়ে যে এইরকম মিথ্যে বলতে পারে তার গুণ নির্দ্দেশ করবার মতন বিশেষণ বোধহয় পৃথিবীর কোন ভাষার অভিধানের মধ্যে পাওয়া যায় না।

কথাটা শুনে বোধহয় স্বামীজিরও মাথা ঘুরে গিয়েছিল। তিনি একটু চুপ করে থেকে তাকে বল্লেন—বৎস, এ বিষয়ে তুমি আমার চেয়ে ঢের উন্নত।—তুমি ধন্য।

তিনি আবার প্রশ্ন করলেন—আমি শুনেছি তুমি ব্যবসা-দার ছিলে। ব্যবসায় অনেক সময় অনেক অসৎ উপায় অবলম্বন করতে হয়, তা ছাড়া অর্থের ওপরেও লোভ অত্যন্ত বাড়ে। তুমি কি কখনও সেই লালসায় অভিভূত হয়েছিলে?

প্রশ্ন শুনে দাদা বিকট একটা হাসির আওয়াজ করলে, কিন্তু এক মুহূর্ত্ত পরেই বুঝতে পারলুম যে সেটা হাসি নয়, কান্না! হাউ হাউ করে কেঁদে সে বলতে লাগল—প্রভু আমি অতি লোভী, বিবাহ না করলেও আমার সংসার ছিল খুব বড়, কিসে কেমন করে আমি আমার বাপ মা, ভাই, বোনদের সুখে স্বচ্ছন্দে রাখতে পারবো রাত-দিন কেবল সেই চিন্তাই করেছি, আর সেই লোভে তন্ময় হোয়ে অর্থ উপার্জ্জন করেছি।

আমার কি মুক্তি হবে না? এই বলে সে সচ্চিদানন্দের পা জড়িয়ে ধরলে।

স্বামীজি তাকে আশ্বাস দিতে লাগলেন, কিন্তু সে সব কথা কি তার কানে যায়—সে থেকে থেকে গুমরে গুমরে কেঁদে ওঠে আর বলে—প্রভু আমার কি হবে?

সচ্চিদানন্দ আর কোন প্রশ্ন না করে তার বুকে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন। উত্তেজনায় তার শ্বাস-প্রশ্বাসের ভয়ানক কষ্ট হতে লাগল। আস্তে আস্তে চোখ দুটো বুঁজিয়ে ফেলে সে একটুখানি শান্ত হল।

কিছুক্ষণ এই রকম স্থির হয়ে পড়ে থেকে আবার সে ভেউ ভেউ করে কেঁদে উঠল। আমি ভাবলুম—আবার কি হল!

দাদা আবার সুরু করলে—প্রভু আমি অতি পাপী, আমি অতি চোর, জোচ্চোর—যখন ব্যবসা করতুম তখন একদিন হিসেব মিলিয়ে বাড়ী যাবার সময় দেখি যে, কয়েকটা টাকা তবিলে বেশী পড়ে রয়েছে। বোধহয় কেউ ভুলে বেশী দিয়ে গিয়েছে মনে করে আমি আমার কর্ম্মচারীদের টাকাটা আলাদা করে রেখে দিতে বলেছিলুম। আজ মনে হচ্চে টাকাটা ত কাউকে দেওয়া হয় নি! আমার কি হবে?—বলে সে কপাল চাপড়াতে লাগল আর থেকে থেকে উঠে বসতে আরম্ভ করলে।

সামনে একটা নরহত্যা হয় দেখে স্বামীজি সেখান থেকে উঠে বাইরে চলে গেলেন।

দাদার আগ্রহে আবার তাঁকে ডেকে আনতে হল। এবার

সে তাঁকে কি বল্লে জান? বিলাস একবার গলাটা সাফ করে ভৈরবের দিকে চেয়ে একটু নীচু গলায় বল্লে—এবার সে কি বল্লে জান? এবার দাদা বল্লে—প্রভু আপনি বলুন আমার দ্বারা পৃথিবীর কোন উপকার হতে পারবে কি? আমার ইচ্ছা যে আমি এইখানেই আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে যাই। আপনি যদি আশ্বাস দেন ত এবারের মতন আমি মৃত্যুকে ফিরিয়ে দিতে পারি। আপনার আশীর্ব্বাদে আমার সে শক্তি আছে।

দাদার এই কথা শুনে আমার মাথার ভেতরে কি রকম একটা অস্বাভাবিক যন্ত্রণা হতে লাগল। সেখানে আর দাঁড়িয়ে থাকা চল্‌ল না। কোন ক্রমে দেয়াল ধরে ধরে বাইরে চলে এলুম।

সমস্ত রাত্রি ধরে স্বামীজিতে আর দাদাতে কি কথাবার্ত্তা হল জানিনে। সকালবেলা উঠে দেখি সে দিব্যি হেঁটে ফিরে বেড়াচ্ছে। আমার সঙ্গে দেখা হতেই সে আমায় ডেকে বলে দিলে—ধুনোর কথাটা কাউকে বলিস নি—

আমি মনে মনে ভাবলুম—ও বাবা ধুনোর এত গুণ!

এই ব্যাপারের মাসখানেক পরে আমি আর আমাদের মঠের আর একজন সেবক ত্রিকুট মঠের একজন সন্ন্যাসীকে দেখতে গিয়েছিলুম। সেখানে আমরা প্রায় ছ-মাস ছিলুম। এই ত্রিকুট মঠ আমাদের মঙ্গল মঠ থেকে মাসখানেকের রাস্তা। এই ত্রিকুট মঠে বসেই আমরা শুন্‌তে পেলুম যে আমাদের মঠে

আনন্দ স্বামী নামে একজন মস্ত অদ্বৈতবাদী পুরুষ এসেছেন। সচ্চিদানন্দ এই সন্ন্যাসীকে গুরু করেছেন। দেশ-বিদেশ থেকে লোকে এই মহাত্মাকে দেখতে আসছে। তিনি অনেক দুরারোগ্য ব্যাধিও সারিয়ে দিচ্ছেন।

নিজেদের মঠে এমন একজন মহাত্মার সমাগম হয়েছে শুনে আমরা সেইদিনই ত্রিকুট ত্যাগ করে মঙ্গল মঠের দিকে যাত্রা করলুম।

মঠে এসে দেখি সেখানে চারিদিকে ধূম ধাড়াক্কা লেগে গিয়েছে। সেবকদের থাকবার জন্য বড় বড় বাড়ী হচ্চে। এক-দিকে একটা বড় আতুর-আশ্রম খোলা হয়েছে, লোকে লোকারণ্য। তার মধ্যে বড় লোকই বেশী। স্বামী সচ্চিদানন্দ সম্প্রতি গুরুর আদেশে প্রচারে গিয়ে অনেক অর্থ ও অনেক শিষ্য সংগ্রহ করে এনেছেন। আনন্দ স্বামী থাকবার জন্য সুন্দর একখানা শ্বেত পাথরের মন্দির হয়েছে, স্বামীজি তার মধ্যে ধূনী জ্বালিয়ে বসে আছেন।

মন্দিরে ঢুকে স্বামীজিকে প্রণাম করে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে দেখি—হরি! হরি! আনন্দ স্বামী আর কেউ নন, আমার দাদা—শ্রীযুক্ত জপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়—

মঠের একজন সেবককে ব্যাপার কি তা জিজ্ঞেস করে জানলুম—স্বামীজি একজন ছদ্মবেশী মহাপুরুষ, সচ্চিদানন্দের তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে ছলনা করতে এসেছিলেন। সচ্চিদানন্দ একদিন স্বপ্নে এই কথা জানতে পেরে সকালে উঠে তাঁর পায়ের

ওপর পড়াতে তিনি সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে শিষ্যত্বে বরণ করে নিয়েছেন। ক্রমে শুনলুম যে আমার অবর্ত্তমানে সেখানে অনেক কাণ্ড হয়ে গিয়েছে। আনন্দকে একদিন সাপে ছোবল মেরেছিল, আসল জাত সাপ। তিনি ধ্যানস্থ হয়ে সে বিষ নামিয়ে দিয়েছেন। এই রকম অনেক অলৌকিক কাণ্ড তিনি কয়েকমাসের মধ্যে করে ফেলেছেন।

দেখে শুনে আমার মনে অহঙ্কার হল যে, এমন দাদার ভাই আমি। কিন্তু সচ্চিদানন্দের মতন অমন মহাপুরুষের সঙ্গে এই রকম ব্যবহার আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারলুম না। একদিন দাদাকে আড়ালে পেয়ে আমি খুব গালাগালি দিলুম। গাল খেয়ে সে আমায় গোটাকয়েক হীরের আংটি দিয়ে বল্লে—এগুলো নিয়ে তুই সংসারে ফিরে যা, বিক্রী করে যা হবে তাতে তোর সারাজীবন সুখে কেটে যাবে।

বুঝলুম তার চক্ষুলজ্জা এখনও কাটেনি।

মঙ্গল মঠ আর আনন্দ স্বামীর নাম দিনে দিনে প্রচার হয়ে পড়তে লাগল। মঠ থেকে অনেক সৎকাজ হতে লাগল। চারিদিক থেকে নতুন নতুন সেবক এসে জুটতে আরম্ভ করল। এত গোলমালের মধ্যেও দাদার অহিফেন সেবন ও মাঝে মাঝে রাত্রে লুকিয়ে বেরিয়ে যাওয়া চলতে লাগল। একবার হঠাৎ ঠাণ্ডা লেগে তিন দিনের জ্বরে আনন্দ পঞ্চত্ব পেলেন।

সেবকেরা বল্লে—স্বামীজি দেহত্যাগ কল্লেন—বাংলা খবরের কাগজওয়ালারা লিখলে—একে একে নিভেছে দেউটী—সমস্ত

ভারতবর্ষ বল্লে—দেশের একজন মহাত্মা অকালে চলে গেলেন।

আমি সেইদিনই মঠ ছেড়ে কলকাতায় চলে এলুম। কলকাতার বীডন-কুঞ্জে মহতী সভা হল। অদৃষ্টের বিড়ম্বনায় পড়ে আমায় সেই সভায় দাঁড়িয়ে একঘণ্টা ধরে আনন্দের গুণাবলী ব্যাখ্যা করতে হয়েছে। আনন্দ স্মৃতি-সমিতি হল, আনন্দ ধনভাণ্ডার খোলা হল। ভাণ্ডার-রক্ষকটী মাসকয়েক হল টাকা-কড়ি মেরে দিয়ে ফেরার হয়েছেন।

এখনও এই আনন্দ স্বামীর নামে মঠ চলেছে, দেশ-বিদেশে এই মঠের শাখা পর্য্যন্ত স্থাপিত হয়েছে। দলে দলে রোগী তার সমাধির পাশে হত্যে দিয়ে পড়ে থাকে, তারা ওষুধও পায়, শুনেছি তাতে রোগও সারে।

বিলাসের গল্পের পর আমাদের সেদিনকার মতন আড্ডা ভাঙল। পরদিন ভৈরব এসে বল্লে—সে ত্রিকুট মঠে যাবার সমস্ত বন্দোবস্ত ঠিক করে ফেলেছে।

৬। **চিত্রালি**—শ্রীসুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
৭। **দূর্ব্বাদল** (২য় সংস্করণ)—শ্রীযতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত।
৮। **শাশ্বতভিখারী** (২য় সং)—শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায়।
৯। **বড়বাড়ী** (পঞ্চম সংস্করণ)—শ্রীজলধর সেন।
১০। **অরক্ষণীয়া** (পঞ্চম সংস্করণ)—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
১১। **ময়ূখ** (২য় সং)—শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ।
১২। **সত্য ও মিথ্যা** (২য় সংস্করণ)—শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।
১৩ **রূপের বালাই** (২য় সং) —শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায়।
১৪ **সোণার পদ্ম** (২য় সং)—শ্রীসরোজরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়।
১৫ **লাইকা** (২য় সংস্করণ)—শ্রীমতী হেমনলিনী দেবী।
১৬ **আলেয়া** (২য় সংস্করণ)—শ্রীমতী নিরুপমা দেবী।
১৭ **বেগম সমরু** (সচিত্র)—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।
১৮ **নকল পাঞ্জাবী** (৩য় সংস্করণ)—শ্রীউপেন্দ্রনাথ দত্ত।
১৯ **বিল্বদল** (২য় সং)—শ্রীযতীন্দ্রমোহন সেন গুপ্ত।
২০ **হালদার বাড়ী** (২য় সং)—শ্রীমুনীন্দ্রপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী
২১ —শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।
২২ **লীলার স্বপ্ন**—শ্রীমনোমোহন রায় বি-এল।
২৩ **সুখের ঘর** (২য় সং)—শ্রীকালীপ্রসন্ন দাশগুপ্ত এম-এ
২৪ (২য় সং)—শ্রীমতী অনুরূপা দেবী
২৫ **রসির ডায়েরী**—শ্রীমতী কাঞ্চনমালা দেবী।
২৬ **ফুলের তোড়া** (২য় সং)—শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী।
২৭ **ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস**—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঘোষ।
২৮ **সীমন্তিনী**—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু।
২৯ **নব্য-বিজ্ঞান**—অধ্যাপক শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম-এ।
৩০ **নববর্ষের স্বপ্ন**—শ্রীসরলা দেবী।
৩১ **নীলমাণিক**—রায় সাহেব শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন বি-এ।
৩২ **হিসাব নিকাশ**—শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত এম-এ, বি-এল্।

৩৩। **মায়ের প্রসাদ**—শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ঘোষ।
৩৪। **ইংরাজী কাব্যকথা**—শ্রীআশুতোষ চট্টোপাধ্যায় এম-এ।
৩৫। **জলছবি**—শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়।
৩৬। **শয়তানের দান**—শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায়।
৩৭। **ব্রাহ্মণ পরিবার**—(২য় সং)—শ্রীরামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য।
৩৮। **পথে-বিপথে**—শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সি-আই-ই।
৩৯। **হরিশ ভাণ্ডারী** (তৃতীয় সংস্করণ)—শ্রীজলধর সেন।
৪০। **কোন্ পথে**—শ্রীকালীপ্রসন্ন দাশগুপ্ত এম-এ।
৪১। **পরিণাম**—শ্রীগুরুদাস সরকার এম-এ।
৪২। **পল্লীরাণী**—শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।
৪৩। **ভবানী**—৺নিত্যকৃষ্ণ বসু।
৪৪। **অমিয় উৎস**—শ্রীযোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়।
৪৫। **অপরিচিতা**—(২য় সং)শ্রীপান্নালাল বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এ।
৪৬। **প্রত্যাবর্ত্তন**—শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।
৪৭। **দ্বিতীয় পক্ষ**—ডাঃ শ্রীনরেশচন্দ্র সেন গুপ্ত এম-এ, ডি-এল।
৪৮। **ছবি**—(২য় সংস্করণ)—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
৪৯। **মনোরমা**—শ্রীসরসীবালা বসু।
৫০। **সুরেশের শিক্ষা**—শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম-এ।
৫১। **নাচ্ওয়ালী**—শ্রীউপেন্দ্রনাথ ঘোষ এম-এ।
৫২। **প্রেমের কথা**—শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ।
৫৩। **গৃহহারা**—শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।
৫৪। **দেওয়ানজী**—শ্রীরামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য।

৫৫। কাঙ্গালের ঠাকুর—(দ্বিতীয় সংস্করণ)—শ্রীজলধর সেন
৫৬। গৃহদেবী—শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার।
৫৭। হৈমবতী—শ্রীচন্দ্রশেখর কর।
৫৮। বোঝা পড়া—শ্রীনরেন্দ্র দেব।
৫৯। বৈজ্ঞানিকের বিকৃত বুদ্ধি—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ রায়।
৬০। হারান ধন—শ্রীনসীরাম দেবশর্ম্মা।
৬১। গৃহ-কল্যাণী—শ্রীপ্রফুল্লকুমার মণ্ডল।
৬২। সুরের হাওয়া—শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র বসু বি-এস্ সি।
৬৩। প্রতিভা—বরদাকান্ত সেনগুপ্ত।
৬৪। আত্রেয়ী—শ্রীজ্ঞানেন্দ্রশশী গুপ্ত বি-এল।
৬৫। লেডী ডাক্তার—শ্রীকালীপ্রসন্ন দাশগুপ্ত, এম-এ।
৬৬। পাখীর কথা—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন, এম-এ, পিএইচ-ডি।
৬৭। চতুর্ব্বেদ—শ্রীভিক্ষু সুদর্শন।
৬৮। মাতৃহীন—শ্রীইন্দিরা দেবী।
৬৯। মহাশ্বেতা—শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ঘোষ।
৭০। উত্তরায়ণে গঙ্গাস্নান—শ্রীশরৎকুমারী দেবী।
৭১। প্রতীক্ষা—শ্রীচৈতন্যচরণ বড়াল বি এল।
৭২। জীবন সঙ্গিনী—শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত
৭৩। দেশের ডাক—শ্রীসরোজকুমারী বন্দ্যোপাধ্যায়।
৭৪। বাজীকর—শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থী।
৭৫। স্বয়ম্বরা—শ্রীবিধুভূষণ বসু। (যন্ত্রস্থ)

নমিতা

শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া প্রণীত।—পুস্তকখানির আখ্যানভাগ খুব বিস্তৃত নহে; কিন্তু সুলেখিকা ইহাতে মনস্তত্ত্বের যে বিশ্লেষণ করিয়াছেন, তাহা অতি সুন্দর। কর্ত্তব্য-পরায়ণতা যে কেমন করিয়া জয়যুক্ত হয়, পরের অনিষ্ট করিতে গেলে যে, কেমন করিয়া নিজেরই অনিষ্ট হয়, তাহা অতি সুন্দরভাবে এই গ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে।

নমিতা'র চরিত্রে যে আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য লেখিকা মহোদয়া লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন, তাহা সার্থক হইয়াছে। বৃহৎ পুস্তক—সুন্দর বাঁধাই—মূল্য—২৲

পল্লীর প্রাণ

শ্রীকালীপ্রসন্ন দাসগুপ্ত এম-এ প্রণীত।—বাঙ্গালার পল্লী-সংস্কার করিয়া পল্লীবাসের পুনঃ প্রতিষ্ঠার দিকে আজকাল দেশের লোকের অনুকূল দৃষ্টি পড়িয়াছে। মৃতকল্প বঙ্গ-পল্লী শরীরে প্রাণ-প্রতিষ্ঠার আয়োজন হইতেছে। কিন্তু পল্লীর সেই প্রাণ কি? কোথায় আছে? কেমন করিয়া তাহার সন্ধান মিলিবে?—এই প্রশ্নের সমাধান ইহাতে সুন্দরভাবে আছে। "পল্লীর প্রাণ" বাঙ্গালার পল্লী-সমাজের নিখুঁত চিত্র। বর্ণনা অতি স্বাভাবিক ও মনোহর। পল্লীর প্রাণ সুধুই পল্লীচিত্র নহে, ইহাতে সহরের ও সহরের পরিচয় পাইবেন। বর্ত্তমান বাঙ্গালার পল্লী ও সহরের প্রভেদ কোনখানে—পল্লী ও সহরের চিত্র পাশাপাশি নিপুণ তুলিকায় অঙ্কিত হওয়ায় সুস্পষ্টরূপে দৃষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ হইতে ভাবিয়া লইবার অনেক জিনিষ পাইবেন। উৎকৃষ্ট সিল্ক বাঁধাই—মূল্য ২॥০ টাকা।